ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী

খুররম মুরাদ

সীরাতে রাসূলের আয়নায়

ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী

খুররম মুরাদ

ভাষান্তর

আবদুস শহীদ নাসিম

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৬৬

১০ম প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪৩৩
চৈত্র	১৪১৮
মার্চ	২০১২

বিনিময় : ৪৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

اسلامي قيادت سيرت رسول الله كے آئينے ميں -এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMEE NETRITTER GUNABOLI. by Khurrum Murad. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 45.00 Only

অনুবাদকের আরয

বর্তমান বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের অন্যতম জনাব খুররম মুরাদ। এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের নিকটও তিনি সুপরিচিতি ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব। ছাত্র জীবনে তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। এর দশ বছর পরে ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে বৃটেনে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নায়েবে আমীর।

জনাব মুরাদ একজন উচ্চস্তরের ইসলামী চিন্তাবিদ। উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় এ যাবত তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলায় অনূদিত তার "ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক" বইটি এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অতিপ্রিয় একখানা বই। তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সেগুলো সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহরই ফল্গুধারা।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অভাব হলো যোগ্য নেতৃত্বের, রাসূলে করীম (স)-এর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্বের। এ রকম নেতৃত্ব তৈরীর ক্ষেত্রে এ গ্রন্থখানা গাইডবুক হিসেবে কাজ করবে।

তাছাড়া এ গ্রন্থের লেখক খুররম জাহ মুরাদ নিজেও এমন একজন নেতা, যিনি মুখে যা বলেন, কলমে যা লেখেন, সে অনুযায়ী নিজের জীবনকেও পরিচালিত করেন। আমাদের নেতা রাসূলে খোদা (স)-এর যেসব গুণাবলী এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, নিজের জীবনকেও তিনি এর কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেছেন।

তাই তাঁর বক্তব্য গভীর হৃদয়গ্রাহী, অত্যন্ত প্রভাবশালী ও আকর্ষণীয়।

প্রথম নযরেই বইটি অনুবাদ করার ইচ্ছা জাগে। এবার যখন তিনি ঢাকায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের সম্মেলনে আসেন, তখন গ্রন্থখানার অনুবাদ কাজ তড়িৎ শেষ করতে তাকিদ করে যান। এ গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত উচ্চাংগের ভাষা ব্যবহার করেছেন। অনুবাদে ভাষার সেই অলংকার রক্ষা

করা হয়তো সম্ভব হয়নি। আজকে গ্রন্থখানার অনুবাদ শেষ হওয়ায় আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করছি।

আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থ দ্বারা ইসলামী আন্দোলনকে উপকৃত করুন এবং এ নগণ্য অনুবাদককেও এর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন, আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম

ঢাকা ১৩-৭-১৯৮৭

প্রারম্ভিক কথা

আজ গোটা দুনিয়ার অসংখ্য মানব কাফেলা এ সংকল্প নিয়ে চলছে যে, তারা তাদের জীবনের সফরকে ঐ পথেই পরিচালিত করবে, যে পথ প্রদর্শন করে গিয়েছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)। তারা তাদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনকে সেই হিদায়াত অনুযায়ী গড়ে তুলতে চায়, যা রেখে গেছেন রাসূলে খোদা (স)। বিগত কয়েকশ শতাব্দী থেকে মানব কাফেলা এমন এক পথে চলে আসছে যা তাঁর পথ থেকে ভিন্নতর ও বিপরীতমুখী। তাই বর্তমান দুনিয়ায় তাঁর পথে চলাটা চাট্টিখানি কথা নয়। এ পথে রয়েছে অসংখ্য বাধা প্রতিবন্ধকতা। সীমাহীন সমস্যা সংকট। অপরদিকে পথিকরাও দুর্বল অক্ষম। আরোহীরা ক্লান্ত রোগাক্রান্ত ও বৃদ্ধ। পথ জগদ্দলময় কিন্তু সান্ত্বনার বিষয় হচ্ছে, তাঁর পদাংকের বদৌলতে এ পথে মরুভূমির পাথরও রেশমী কোমল। এ জন্যে হাজারো সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সংখ্যা বেড়েই চলেছে কাফেলার। অব্যাহত রয়েছে সফরের গতি। বর্তমান দুনিয়ায় এসব কাফেলার নাম ইসলামী আন্দোলন।

যে কাফেলা নিজের ও মানব সমাজের জীবনযাপনের জন্যে বিনির্মাণ করতে চায় একটি রাজপথ, তার কামিয়াবীর জন্যে স্বীয় ঈমান, ইয়াকীন, ইচ্ছা, সংকল্প, আমল, আচরণ এবং চরিত্র ও কুরবানীর সাথে সাথে তার একজন উৎকৃষ্ট সেনাপতিরও প্রয়োজন। যেমনি করে কাফেলার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্যে একটি মাত্র পদাংকই অনুসরণযোগ্য এবং তা হচ্ছে রাসূল মুস্তফার পদাংক। তেমনি, কাফেলার নেতার জন্যেও সেই একই পদাংকের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও কামিয়াবী, যা রেখে গেছেন প্রথম নেতা রাসূলুল্লাহ (স)। সত্য কথা বলতে কি, কাফেলার প্রতিটি সদস্যই কোনো না কোনো পর্যায়ের এবং কোনো না কোনো স্থানের নেতা। তাদের প্রত্যেকেরই সেই হেদায়াত ও পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী যা রয়েছে নবী মুস্তফা (স)-এর পদাংকে।

তাঁর পদাংকগুলোকে স্পষ্ট আলোকিত করার যোগ্যতা তো আর আমার নেই। এ পথে ইল্‌মের চেয়ে তাকওয়া, আমল ও রাসূলকে অনুসরণের পাথেয় অধিক প্রয়োজন। আমি এসব দিক থেকেই দরিদ্র। রাসূলে খোদার (স) সীরাত সম্পর্কে কিছু বলা বা লেখা এমনিতেই সূর্যকে চেরাগ দেখানোর সমতুল্য। এ কোনো চাট্টিখানি সাহসের কথা নয়।

কিন্তু করাচীতে জমিয়াতুল ফালাহ্‌র উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে "নেতা ও শিক্ষক হিসেবে নবী করীম (স)" শিরোনামে তাঁর সীরাত ও আদর্শের আলোচনা করতে হয়। কিছুদিন পর সেখানকার সেকথাগুলোই একটা খসড়া পাণ্ডুলিপি আকারে আমাকে দেয়া হয়।

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব আমার নিকট পরিষ্কার ছিলো। এজন্যে কিছুটা সাহস করে সেই বক্তৃতাকে ভিত্তি করেই এ বইটি তৈরী করি। এখন এই লেখাটি আকারে ও প্রকারে উভয় দিক থেকেই আর সেই বক্তৃতার মতো থাকেনি, যা জমিয়াতুল ফালাহর সমাবেশে পেশ করা হয়েছিলো। অবশ্য মূল বিষয়বস্তু সেই বক্তৃতা থেকেই নেয়া হয়েছে। আমার ধারণা, এর দ্বারা সম্ভবত ইসলামী আন্দোলনের কাফেলার কোনো প্রয়োজন পূরণ হতে পারে।

এতে কোনো কথাই সম্ভবত নতুন নয়। সীরাতে রাসূলের উপর অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবন কাহিনী এতোই মিষ্ট মধুর যে, তা যতোই দীর্ঘ হয়, অপূর্ণই থেকে যায়। সত্য কথা হলো, যা কিছু লেখা হওয়া উচিত তার তুলনায় এখনো কিছুই লেখা হয়নি। এ অনুভূতিই আমাকে এ পুস্তিকা প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার দ্বারা যদি কেউ সেই ভাণ্ডারের একটি মুক্তা এবং সেই সূর্যের একটি রশ্মিও লাভ করতে পারে, তবে সেই সওয়াব থেকে আমি কেনো বঞ্চিত হবো ? সাথে সাথে আমার এ আস্থা এবং বিশ্বাসও অশ্বারোহীর পায়ের কাটার মতো আমার শরীরে ফুটতে থাকে যে, সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমগ্র দৌলত নিয়ামত কেবল তাঁর আদর্শের অনুকরণের মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে।

আমি ভাই সাইয়েদ লুৎফুল্লাহ সাহেব এবং মুসলিম সাজ্জাদের নিকট কৃতজ্ঞ যে, তারা আমাকে বক্তৃতা করার সুযোগ দিয়েছেন এবং খসড়া পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দিয়েছেন। কিন্তু সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার জীবন সংগিনী লুমআতুন নূরকে, যার ধৈর্য সহনশীলতা এবং সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া কয়েক দিন ধরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ কাজে লেগে থাকতে পারতাম না।

আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করছি, তিনি যেনো এ ক্ষুদ্র উপহারটুকু কবুল করে নেন এবং সবার আগে আমাকে একথাগুলোর উপর আমল করার তাওফিক দান করেন।

খুররম মুরাদ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লিঃ বৃটেন

সূচীপত্র

১. রাসূলের আদর্শ ১৩
আদর্শ নেতা ও শিক্ষক ১৩
কুরআন ও সীরাতে রাসূলের সম্পর্ক ১৫
কুরআনে সীরাত অধ্যয়নের পন্থা ১৬

২. রাসূল (স)-এর দাওয়াত ও
দাওয়াতের উদ্দেশ্য ২২
দাওয়াতের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে ২২
এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ২৩
(ক) আল্লাহর বন্দেগীর প্রাধান্য ২৩
(খ) মিথ্যা খোদাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ২৫
(গ) দাওয়াতের হেফাযত ২৬
(ঘ) দাওয়াতের সকল অঙ্গের প্রতি লক্ষ্যারোপ ২৮
১. সতর্কীকরণ ২৮
২. ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান ২৯
৩. সুসংবাদ দান ২৯
ঙ. বিন্যাস ৩০

৩. নবী পাক (স) এবং দাওয়াতে দীন ৩২
গুরুদায়িত্বের অনুভূতি এবং সার্বক্ষণিক ধ্যান ও ব্যাকুলতা : - ৩২
ক. আল্লাহর কাজ মনে করার ধরন ৩৪
খ. মালিকের তত্ত্বাবধানে ৩৪
গ. মর্যাদা ও যিম্মাদারীর অনুভূতি ৩৬
ঘ. দুর্বহ কালাম ৩৬
ঙ. সার্বক্ষণিক ধ্যান ও পেরেশানী ৩৮

স্বীয় প্রস্তুতি ৩৯
ক. কুরআনের সাথে নিবীড় সম্পর্ক ৩৯
খ. জ্ঞান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ৪১
গ. কিয়ামুল লাইল ও তারতীলুল কুরআন ৪২
ঘ. যিক্‌রে ইলাহী ৪৩
ঙ. সবর ৪৪

৪. বিরুদ্ধবাদীদের সাথে রাসূলে
খোদার আচরণ ৪৫
ক. মৌখিক বিরোধিতা ৪৫
খ. মোকাবিলা এবং জিহাদ ৫০
গ. উত্তম নৈতিকতা ৫২
ঘ. মন্দের জবাব ভালো দিয়ে ৫৩
তায়িফের ঘটনা ৫৪

৫. আন্দোলনের সাথীদের সাথে
রাসূল (স)-এর আচরণ ৫৬
রাউফুর রাহীম ৫৭
ক. মর্যাদার অনুভূতি ও নিবীড় সম্পর্ক ৫৯
খ. তালীম ও তাযকিয়া ৬১
গ. পর্যবেক্ষণ ও ইহ্‌তেসাব ৬৫
ঘ. যোগ্যতা ও সামর্থ অনুযায়ী আচরণ ৬৭
ঙ. কোমলতা ও সহজতা ৬৮
চ. ক্ষমা ও মার্জনা ৭৮
ছ. পরামর্শ ৮০
জ. বিনয় ৮৩
মনোবাসনা ৮৪

بسم الله الرحمن الرحيم

১. রাসূলের আদর্শ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা সবটুকুই সেই মহান সত্তার জন্যে, যিনি নিখিল জগতের রব। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। দেখবার, শুনবার, চিন্তা করবার ও বুঝবার মতো নিয়ামত দান করেছেন। ইচ্ছা শক্তির আযাদীর মতো মহান আমানত দান করেছেন। আমাদের হিদায়াতের জন্যে রিসালাতের ধারাবাহিকতা কায়েম করেছেন।

সালাম ও আনুগত্যের নজরানা পেশ করছি সেই আখিরী রাসূলের (স) খেদমতে, যিনি আমাদের মালিকের হিদায়াত আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন, আল্লাহর দিকে আমাদের আহ্বান করেছেন। সুসংবাদ দিয়েছেন। সাবধান ও সতর্ক করেছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের প্রশিক্ষণ এবং সঠিক পথে জীবনযাপনের নির্দেশনা দান করেছেন।

আদর্শ নেতা ও শিক্ষক

রাসূলে করীম (স)-এর জিন্দেগী এক প্রজ্জ্বল প্রদীপ 'সিরাজাম মুনীরা'।[১] কুরআন মজীদে এ একই 'সিরাজ' (প্রদীপ) শব্দ দ্বারা সূর্যের উপমা পেশ করা হয়েছে।[২] আমাদের উপরের এ সূর্য, তাপ, শক্তি ও জীবনের এমন এক পরিপূর্ণ ভাণ্ডার, যাকে আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টির জন্যে তাপ, শক্তি ও জীবন লাভের উৎস হিসেবে তৈরী করেছেন। তার কিরণ রশ্মি এসব নিয়ামতের ভাণ্ডার বয়ে নিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি বন্দরে একইভাবে আলোকোদ্ভাসিত হয়। তার একটি আলোক রশ্মিও এমন নেই, যেটাকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া যায়। চিন্তা করলে বুঝা যায়, তার অস্তিত্বকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা কেবল অসম্ভবই নয় ইনসাফেরও খেলাফ।

নবী পাকের পবিত্র জিন্দেগীর অবস্থাও ঠিক এ রকমই। মানবতার প্রকৃত জীবন এবং তাপ অর্জনের উৎস তিনিই। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জিন্দেগী এক অবিভাজ্য একক। সূর্যেরই মতো তাঁর জিন্দেগীর প্রতিটি দিক ও বিভাগ

---

১. সূরা আহযাব ঃ ৪৬

২. সূরা নূহ ঃ ১৬, সূরা আন নাবা ঃ ১৩

থেকে আলোক ও হেদায়াতের পাথেয় সমান ভাবে পাওয়া যায়। এতোটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ হিসেবে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহর রাসূল হিসেবে তাঁর পূর্ণাঙ্গ আদর্শ আমাদের অনুসরণীয়।

তাঁর জীবনাদর্শে আমাদের চিন্তা-ভাবনার জন্যে রয়েছে জ্ঞান। রূহ ও আত্মার জন্যে রয়েছে শান্তি ও পরিতুষ্টির সামগ্রী। আমল ও কর্মের জন্যে রয়েছে আদর্শ। এ অথই ভাণ্ডার থেকে আমরা কোন্ মণি-মুক্তাগুলোকে বাছাই করবো ? কোন্গুলো দিয়ে আমাদের থলে ভর্তি করবো ? এ বাগানের কোন্ ফুলগুলো দিয়ে আমাদের ফুলদানিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবো। এ সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিনও বটে আবার সহজও বটে। কঠিন এজন্যে যে, ভাণ্ডার অসীম আর আমাদের অঞ্জলী সীমিত। কিছু তুলে নিলে কিছু যাবে থেকে। যা কিছু থেকে যাবে, সেদিকেও নিবদ্ধ থাকবে আমাদের দৃষ্টি। হৃদয় থাকবে তার সাথে আটকা। কী গ্রহণ করবো, তা কঠিন ব্যাপার নয়। বরঞ্চ কী ত্যাগ করতে হবে সেটাই কঠিন ব্যাপার। আর সহজ এ কারণে যে, আমরা যা কিছুই গ্রহণ করবো সেগুলো কোনো অবস্থাতেই ঐগুলো থেকে নিকৃষ্ট নয়, যেগুলো গ্রহণ করতে পারবো না।

নিজেদের ধারণ ক্ষমতার সংকীর্ণতা, দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, সময় ও যুগের প্রয়োজনে এবং আমাদের ফায়দা লাভের সহজতা বিধানের জন্যে আমরা বাধ্য হয়ে নবী পাকের জিন্দেগীকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করি। কখনো আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে, কখনো সিপাহ্সালার হিসেবে। মোটকথা, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করে আমরা এ প্রদীপ থেকে রৌশনী লাভের চেষ্টা করি।

আজ আমি আপনাদেরকে আমার সাথে সেই নিয়ামতে শরীক করতে চাই, হেদায়াত হিসেবে যা আমি নবী পাক (স)-এর নেতৃত্বে ও শিক্ষকতা জিন্দেগী অধ্যয়ন করে আমার নিজ থলের মধ্যে জমা করেছি। আমার কাছে যতোটুকু আছে পরিপূর্ণতার দৃষ্টিতে তা নেহায়েতই কম। আর আমার কাছে যেটুকুই আছে এ সংক্ষিপ্ত সময়ে তারও কিছু অংশই মাত্র আপনাদের সামনে পেশ করতে পারবো। কিন্তু আমার এবং আপনাদের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা এবং যোগ্যতা ও সামর্থের যে কমতি রয়েছে, তার তুলনায় এটুকুই অনেক। আর আমল করার ইচ্ছা থাকলে তো একটি কথাও যথেষ্ট। ফুলকুঁড়িকে ফুটিয়ে দেবার এবং তাকে রংগীন ও সৌরভময় করার জন্যে একটি সূর্যের কিরণ রশ্মিও যথেষ্ট হয়ে যায়।

এ কথা খুবই সত্য যে, নবী পাক (স)-এর জিন্দেগীকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে তাঁর পবিত্র জীবনের সাথে ইনসাফ করা সহজসাধ্য কাজ নয়। আর নেতা এবং শিক্ষক হিসেবে তাঁকে পৃথক পৃথকভাবে দেখা তো সম্পূর্ণই অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, নবুওয়াতের সূচনা থেকেই তিনি শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক আর শেষ পর্যন্ত ছিলেন তিনি শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক। আর এ শিক্ষা ও হেদায়াতের বাস্তবায়নের জন্যেই ছিলো তাঁর নেতৃত্ব।

মূলত, শিক্ষা দানই রিসালাতের বুনিয়াদী দায়িত্ব। শিক্ষা দানের মাধ্যমেই তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন শুরু করেন। নবুওয়াতী জিন্দেগীর প্রথম মুহূর্ত থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মানুষকে আল্লাহর আয়াত, তাঁর কিতাব এবং হিকমাহ্ শিক্ষা দিতে থাকেন। তাদের সংঘবদ্ধ করে আয়াত, কিতাব এবং হিকমাহ্ অনুযায়ী জীবনযাপনের রাজপথে তাদের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। সূর্যোদয় হলে মানুষ জেগে উঠে। জীবন কাফেলার পথ চলতে শুরু করে। দেহ ও মনে আন্দোলন সৃষ্টি হয়। মানুষ স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপূর্ণতা সাধনে তৎপর হয়। নবী পাক (স)-এর প্রোজ্জ্বল প্রদীপ এদিক থেকে আমাদের জন্যে কোন্ নির্দেশনার আলোকপাত করছে ? সেটাই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়। আমরাও আজ একনিষ্ঠ হৃদয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, রাসূলে খোদাকে আমরা আমাদের জীবন কাফেলার সেনাপতি বানাবো। তাঁর রেখে যাওয়া সেই রিসালাতী দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে আমরা তৎপর হবো। যার জন্যে তিনি তাঁর গোটা জিন্দেগীকে উৎসর্গ করেছিলেন।

কুরআন ও সীরাতে রাসূলের সম্পর্ক

আরেকটি কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই। তাহলো, এখানে আমি শুধু রাসূলে খোদার জীবনের সেসব দিকের উপরই আলোচনা সীমিত রাখবো, যেসব দিকের উপর কুরআন থেকে আলো বিকীর্ণ হয়েছে। দুটি কারণে এরূপ করবো। একটি কারণ হলো, যেহেতু আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে চাই। দ্বিতীয় কারণ হলো, কুরআন এবং সীরাত পাকের মাঝে যে নিবীড় সম্পর্ক বিদ্যমান তা সম্মুখে নিয়ে আসতে চাই।

আমরা সাধারণত এ দুটোকে আলাদা জিনিস মনে করি। এর কারণ হলো, সীরাত গ্রন্থাবলীতে আমরা রাবীদের মাধ্যমেই সমগ্র বর্ণনা পাই। আর কুরআন যাবতীয় ঐতিহাসিক ও স্থান-কাল-পাত্রের বিস্তারিত আলোচনা থেকে প্রায় শূন্য। সাধারণত সীরাত রচয়িতাগণ কুরআন থেকে খুব কমই দলিল প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে মুফাস্সিরগণ

কুরআনের আলোকে তাঁর বাহকের সীরাতকে শোভামণ্ডিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট দৃষ্টি দেন না। ক্ষুদ্র জ্ঞানের ভিত্তিতে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, সর্বোত্তম সীরাত গ্রন্থ হচ্ছে, কুরআন মজীদ। আর কুরআন মজীদের সর্বোত্তম তাফসীর হচ্ছে, নবী পাকের সীরাত। কুরআন হচ্ছে সীরাতের নিখুঁত বর্ণনা, আর সীরাত হচ্ছে কুরআন পাকের জীবন্ত মডেল।

এজন্যে আমি মনে করি, যে ব্যক্তি কুরআনের বিশুদ্ধতম তাফসীর পড়তে চায়, দেখতে চায় জীবন্ত কুরআন আর কুরআনকে পড়তে চায় শব্দের পরিবর্তে আমলী যবানে, তার উচিত ইবনে কাসীর, কাশ্শাফ, আর রাযী প্রভৃতির চাইতে অনেক বেশী করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে অধ্যয়ন করা। সেই যিন্দেগীকে অধ্যয়ন করা যার সূচনা হয়েছিলো 'ইকরা' (পড়) দিয়ে আর পরিণাম দাঁড়িয়েছিলো।

يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ -

সে যেনো রাসূলে খোদার জিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্তেকে নিজের মধ্যে একাকার করে নেয়। তবেই তার জন্যে সম্ভব হবে কুরআনকে উপলব্ধি করা।

একইভাবে যে ব্যক্তি দেখতে চায় রাসূল মুহাম্মাদ (স)-কে, সে যেনো ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ইবনে সাআদ পড়ার আগে কুরআন অধ্যয়ন করে। স্থান-কাল ও ঘটনাপঞ্জীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে সে যেনো এ মহাগ্রন্থ থেকে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ-গুণ-বৈশিষ্ট্য নীতি ও আচরণ নৈতিক চরিত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং জীবনাদর্শকে চয়ন করে। বিশেষ করে সে যেনো অহীর শিক্ষক এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে তাঁর মহান সীরাতকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে। কারণ কুরআন মজীদের প্রতিটি আয়াত এবং প্রতিটি শব্দই তো তাঁর এসব মর্যাদার সাথে অর্ঘ্যফুলের মতো সুগ্রন্থিত।

কুরআনে সীরাত অধ্যয়নের পন্থা

কুরআন কোনো দিক থেকেই সাধারণ গ্রন্থাবলীর ন্যায় কোনো গ্রন্থ নয়। সাধারণ ও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এটি কোনো সীরাতের গ্রন্থও নয়। এতে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার অবতারণা করা হয়নি। অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ দেয়া হয়নি। শিরোনাম দিয়ে দিয়ে আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করা হয়নি। প্যারা-প্যারাগ্রাফেও সাজানো হয়নি। এবং কোনো ইনডেক্সও দেয়া হয়নি যাতে করে লোকেরা খুঁজে বের করতে পারতো যে, শিক্ষক ও

নেতা হিসেবে তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্য এবং নীতি ও আদর্শ কি ? এ কারণে কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক।

কুরআন থেকে সীরাত অধ্যয়ন এবং তথ্য সংগ্রহের জন্যে আমি যে পন্থা (Methodology) অবলম্বন করি, তার দুটি মূলনীতি রয়েছে ঃ

প্রথমত, কুরআন মজীদে যেসব হেদায়াত এবং হুকুম বিধান দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে স্বয়ং নবীপাক (স) এবং তাঁর সাথী মু'মিনদের জামায়াতকে সম্বোধন করে যেগুলো দেয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তাঁর জীবনে জারি ও রূপায়িত ছিলো। (যেমন ইয়া আইয়্যুহার রাসূল, ইয়া আইয়্যুহান নাবী, ইয়া আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানু)।

এগুলো অনুযায়ীই তাঁর আমলী জিন্দেগী পরিচালিত ছিলো। তাঁর সীরাত ছিলো এগুলোর বাস্তব সাক্ষ্য। সীরাতের গ্রন্থাবলী থেকে ঘটনাবলীর উদ্ধৃতি দিয়েও একথা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এর দলিল প্রমাণ স্বয়ং কুরআনেও রয়েছে। যেমন (১) তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম (اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ) প্রথম মু'মিন (اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ) এবং সর্বাগ্রে সর্বাধিক আমলকারী ও মান্যকারী। (২) তাঁর কথা ও কাজে কোনো প্রকার বিরোধ ও অসামঞ্জস্য ছিল না। তাঁর যবান দিয়ে যেকথা বের হতো তাঁর আমল তার বিপরীত হওয়া সম্ভবই ছিলো না। তিনি কখনো তাঁর রবের নির্দেশ অমান্য করেননি। (৩) তাঁকে কেবল দ্বীন প্রচারের (بَلِّغْ) নির্দেশই দেয়া হয়নি, বরঞ্চ তার উপর সাক্ষ্য (شَاهِد) হওয়ার দায়িত্বও অর্পিত হয়েছিলো।

এভাবে আমি মনে করি, তাঁকে যদি যিকর বা তাসবীহ করার কিংবা তাকবীর বা ক্বিয়ামুল লাইলের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে, তবে আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি যে, তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনে অবশ্যি যিক্‌র, তাসবীহ, তাকবীর এবং ক্বিয়ামুল লাইল করতেন। এমনি করে তাঁকে যদি জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে তবে এর তাবীর হচ্ছে এই যে, তিনি জিহাদ করেছেন। তাঁকে যদি পরামর্শ করার, কোমল আচরণের, দয়া ও ক্ষমার এবং জাহিলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত না হওয়ার তা'লীম দেয়া হয়ে থাকে, তবে মূলতই তার সীরাতে এ বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যি মওজুদ ছিলো। হেদায়াত ও হুকুম আহকামের অলংকারের মধ্যে যেনো সীরাত পাকের সৌন্দর্যই শোভামণ্ডিত। আর স্বয়ং কুরআনই যেখানে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছে, তাতো সূর্যালোকের মতোই প্রোজ্জ্বল।

দ্বিতীয়ত, কুরআনে হাকীমে যেসব স্থানে ঘটনাবলীর বর্ণনা, আলোচনা ও পর্যালোনা হয়েছে এবং নবী পাক (স)-এর প্রতি সান্ত্বনা ও সহানুভূতির

বাক্য উচ্চারিত হয়েছে, এসব স্থানে মূলত প্রেক্ষিতের প্রেক্ষাপটে তাঁর মহান সীরাতের বিভিন্ন দিকই তুলে ধরা হয়েছে। যেমন কুরআন বলছে : فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ "তাদের (বিরোধীদের) কথা ও বক্তব্য যেনো তোমাকে চিন্তিত না করে" এ সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা বুঝা যায়, বিরোধিতা ও প্রোপাগাণ্ডার ঝড় উঠেছিলো। চর্তুদিক থেকে ঠাট্টা বিদ্রুপ চলছিলো। মানুষ হিসেবে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। অতপর খোদায়ী হেদায়াতের সান্ত্বনা লাভ করে সকল দুশ্চিন্তা দূরে নিক্ষেপ করে তিনি দাওয়াত ও তা'লীমের কাজে মনোনিবেশ করেন। এ অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে দেয়া হয়নি। কিন্তু সংক্ষিপ্ত বর্ণনার অন্তরালে এ পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিস্ফুট। আর এ চিত্র উপলব্ধি না করলে কুরআন অনুধাবনই অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে এবং সীরাতে পাক সম্পর্কে থেকে যাবে অজ্ঞতা।

এখন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। কিছু লোক মনে করে, রাসূলে খোদা (স) দা'য়ী হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে, নেতা হিসেবে, এক কথায় রাসূল হিসেবে তিনি যতো কর্মসম্পাদন করেছেন, যতোগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যেসব পলিসি তৈরী করেছেন এবং যেসব কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন, সবই আল্লাহ তাআলা অহীর মাধ্যমে পূর্বেই তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছেন। পূর্ব থেকেই তাঁকে বলে দেয়া হতো, এখন এটা করো, এখন ওটা করো। রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখন তিনি কোনো বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতেন, যখন কোনো পলিসি তৈরী করতে হতো, কোনো বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হতো, কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন পড়তো, কিংবা দুটি পথের কোনো একটিকে বাছাই করতে হতো, এসব ক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই তাঁর সবকিছু জানা থাকতো যে, এখন কী করতে হবে? এসব ক্ষেত্রে তাঁর কোনো প্রকার পেরেশানী হতো না, কোনো প্রকার দ্বিধা সংকোচ হতো না, কোনো প্রকার চিন্তা করতে হতো না এবং জ্ঞান বুদ্ধিও খাটাতে হতো না।

উপরোক্ত ধারণা থেকে আমার ধারণা ভিন্নতর। সঠিক বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। আমার ধারণা যদি ভুলও হয়, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমার আশা পোষণ করি। আমি আরো আশা করি, তিনি আমার জন্যে অন্তত ইজতিহাদের পুরস্কার সংরক্ষিত রাখবেন। আমার মতে উপরোক্ত ধারণা কুরআন এবং ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণেরও খেলাপ। তাছাড়া এরূপ ধারণা নবী পাক (স)-এর মহান ব্যক্তিত্বের সাথে বেইনসাফীও বটে। তিনিতো কোনো নির্জিব বস্তু ছিলেন না। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। সর্বাধিক জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মকৌশলের অধিকারী।

সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং মানবতার বাগানে সর্বোত্তম ফুল। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, তিনি কুরআনকে শাব্দিক এবং অর্থের দিক থেকে পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং তা হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু যে মহান হৃদয় ও ব্যক্তিত্বের অধিকারীকে কুরআনের মতো বিরাট জিনিস প্রদানের জন্যে মনোনীত করা হয়েছে, যে কুরআন পাহাড়ের প্রতি নাযিল করা হলে পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে যেতো, সেই ব্যক্তি কতো বিরাট ও মহান হৃদয় ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

এজন্যে আমি মনে করি, রাসূল (স) কুরআনের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা নির্ধারণ এবং দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা, এসব কাজই তিনি তাঁর ইজতেহাদ, হিকমাহ, পূর্ণতর জ্ঞান বুদ্ধি এবং নিজ সাথীদের সাথে পরামর্শ করে সম্পাদন করতেন। হ্যাঁ একথাতে অবশ্যি কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহর তত্ত্বাবধান ও হিফাযতে ছিলেন। তাঁর দিলকে ইলম ও হিকমতের নূর দ্বারা আলোকমণ্ডিত করে দেয়া হয়েছে। তাঁর সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে ছিলো একাকার। আমাদের সাধারণ মানুষের মতো তাঁর অবস্থা এরূপ ছিলো না যে, তাঁর কোনো সিদ্ধান্ত আল্লাহর মর্জির বিপরীত হবে। কোনো কোনো ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বা পরে অহী গায়রে মাতলুর মাধ্যমেও হেদায়াত পেয়ে যেতেন। কিন্তু এসব কিছুর সাথে সাথে তিনি একজন মানুষও ছিলেন। মানুষেরই মতো ঘটনা প্রবাহ নিয়ে তিনি চিন্তা-ভাবনা করতেন, সিদ্ধান্ত নিতেন, কখনো পেরেশানী বোধ করতেন, কখনো চিন্তাগ্রস্ত হতেন। এমনি করে মানব হিসেবে এরূপ যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর জীবন প্রবাহের সাথেও ছিলো অবিচ্ছেদ্য । কুরআনী হেদায়াত এবং তাঁর অন্তর্নিহিত আল্লাহ প্রদত্ত হিকমাহ কাজে লাগিয়ে এবং নিজ সাথীদের সাথে পরামর্শ করে গোটা আন্দোলনী জীবনে তিনি বিরাট বিরাট ফায়সালা গ্রহণ করেছেন, আন্দোলনের পথ নির্ধারণ করেছেন, সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন।

বিষয়টা এজন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, এর অনুধাবন ছাড়া কুরআন সুন্নাহর আলোকে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। হালাল দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট, হারামও পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা আছে। কিন্তু এতদোভয়ের মাঝে রয়েছে এক বিস্তীর্ণ ময়দান। সে ময়দানে হালাল ও হারামকে চিহ্নিত করার জন্যে নূরে রিসালাতের আলোকে নিজেদের চিন্তা ও জ্ঞানবুদ্ধিকেই কাজে লাগাতে হবে। আমার এ মতের পক্ষে আমার নিকট দুটি ভিত্তি রয়েছে।

প্রথমত, কুরআন মজীদে তাঁর আন্দোলনী জীবনের অধিকাংশ সিদ্ধান্তের উপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে পরে। এসব সিদ্ধান্ত ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতিতে তিনি আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণ করেছেন। একথা খুবই পরিষ্কার, পূর্ব থেকে দেয়া হেদায়াত অনুযায়ী যদি প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তবে পরবর্তীতে এর পর্যালোচনা হতো অর্থহীন।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে সেনা ফৌজের সাথে যুদ্ধ করবেন, নাকি বাণিজ্য কাফেলার সাথে ? বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কি ফায়সালা করবেন ? ওহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনার ভিতরে থেকে যুদ্ধ করবেন, নাকি মদীনার বাইরে গিয়ে এবং মুনাফিকদের ওযর কবুল করবেন কি করবেন না, এসব ব্যাপারে আগে থেকেই সুস্পষ্ট হেদায়াত দিয়ে দেয়া আল্লাহর জন্যে সম্পূর্ণ সম্ভব ছিলো। কিন্তু তিনি তা করেননি। আযানের বিষয়টা পর্যন্ত পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়। এমন কি তাঁর পর খলীফা কে হবেন, সে বিষয়টা পর্যন্ত মুসলমানদের রায়ের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। নবী পাকের চিন্তা ফিকির এবং জ্ঞান বুদ্ধি প্রমাণের জন্যে এর চেয়ে বড় পরীক্ষা আর কি হতে পারে ? তাঁর দায়িত্ববোধ এবং ইখতিয়ারের এর চেয়ে বড় প্রমাণ কি হতে পারতো।

তাছাড়া কোনো বিষয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যদি পূর্ব থেকেই হেদায়াত এসে থাকে, তবে তা পরিষ্কারভাবে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হতো। যেমন আহযাব যুদ্ধের পরই বনি কুরাইযার প্রতি অভিযান চালানো। এ বিষয়ে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, জিবরাঈল এসে আমাকে বলে গেছেন। কিংবা হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা। বড় বড় সাহাবীগণ পর্যন্ত এ সন্ধিতে আশ্বস্ত হতে পারেননি। অতপর তিনি জানিয়ে দেন যে, এরূপ করা ছিলো আল্লাহর নির্দেশ।

দ্বিতীয়ত, রাসূল (স)-এর আদর্শ ও জীবন চরিতে আমাদের জন্যে যাবতীয় পথনির্দেশ বর্তমান রয়েছে। অনুসরণ করার জন্যে তাঁর আদর্শই আমাদের জন্যে যথোপোযুক্ত। কারণ তিনি ছিলেন একজন মানুষ। একজন মানুষের মতোই তিনি তাঁর আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। বিরোধীরা যখন অভিযোগ করলো ঃ আল্লাহ্ তাআলা কোনো ফেরেশতাকে কেনো তাঁর রাসূল বানিয়ে পাঠালেন না ? তখন কুরআনে এর জবাবে বলা হয়েছে ঃ পৃথিবীতে যদি ফেরেশতা বিচরণ করতো, তবেইতো তাদের হেদায়াতের জন্যে ফেরেশতা আসতো। যেহেতু এখানে বসবাস করে

মানুষ সে কারণে একজন মানুষকেই রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। যিনি তাদেরই মতো পানাহার করেন, বাজার ঘাটে যান। মানুষের জন্যে তার মতো মানুষেরই অনুসরণ করা সম্ভব, কিংবা তার অনুসরণের চিন্তা সে করতে পারে এবং তার মতো হবার আশা পোষণ করতে পারে। মানুষ অতিমানবের কর্মকাণ্ডের কেবল প্রশংসাই করতে পারে, কিংবা তা শুনে ও দেখে ভীত শংকিতই হতে পারে।

আমরা যদি এরূপ মনে করি যে, গোটা আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিলো মেশিন কিংবা রবোটের মতো, যার নিজের কোনো ইখতিয়ার কিংবা মতামতের বিন্দুমাত্র অধিকারও সেখানে ছিলো না, কিংবা তাঁর অন্তরালে ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ এবং মূলত তিনি নিজেই আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন। এরূপ ধারণার ফলশ্রুতিতে আমরা এটাও মনে করে বসবো যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোনো আন্দোলন আর এখন চলতে পারবে না। কেননা এখন তো কোনো রাসূল আসবেন না। যিনি সকল বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা থেকে জেনে বুঝে ফায়সালা করবেন।

পক্ষান্তরে আমরা যদি মনে করি যে, তিনি গোটা আন্দোলন সাধারণত ইজতেহাদ এবং পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করেছেন। তবে আমরা যদিও তাঁর পদধূলির সমান পর্যন্ত হবার চিন্তা করতে পারি না, আর না তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদার কথা কল্পনা করতে পারি, কিন্তু আল্লাহর গোলামী এবং আন্দোলনের সীমার মধ্যে তো আমরা তাঁর মতো হওয়ার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারি। এ প্রচেষ্টায় আমরা তাঁর একশত ভাগের একভাগও যদি লাভ করতে না পারি, হাজারো-লাখো অংশের এক অংশও যদি লাভ করতে না পারি, তার চেয়েও ক্ষুদ্রতম কোনো পর্যায়ে পৌঁছার তামান্নাতো আমরা করতে পারি। এর স্বপ্ন তো আমরা দেখতে পারি।

এ বাসনা, এ তামান্নাই আমাদেরকে রাসূলে খোদার দ্বারে উপনীত করেছে, যাতে করে আমরা তাঁর শিক্ষা, নেতৃত্ব, কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতি দ্বারা আমাদের জন্যে পথনির্দেশ লাভ করতে পারি।

❑

২. রাসূল (স)-এর দাওয়াত ও দাওয়াতের উদ্দেশ্য

একটি দাওয়াত ও একটি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকতে হবে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট। আর লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে থাকা চাই সঠিক ধারণা। সুস্পষ্ট বুঝ। লক্ষ্য উদ্দেশ্য হওয়া চাই স্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী নয়। রদবদল করার মতো নয়। পরিবেশ পরিস্থিতির চাপ এবং কালের আবর্তনে বিকৃত হবার নয়।*উদ্দেশ্য যদি হয় একাধিক তবে সেগুলোর মধ্যে চাই সামঞ্জস্য পূর্ণ বিন্যাস। এ বিন্যাস যেনো ওলট পালট না হয়। শাখা প্রশাখা যেনো মূলের স্থান দখল করে না বসে এবং মূল যেনো গুরুত্বহীন হয়ে না পড়ে।

কারণ, দাওয়াতে দ্বীনের বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মূলকাজ ছিলো কুরআনের। তাই নবী পাক (স) যেনো তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন এবং তাঁর শিক্ষাদান কাজে একথাগুলো গুরুত্বের সাথে মেনে চলেন, কুরআন তার পয়গামের মাধ্যমে সে ব্যবস্থা করেছে।

দাওয়াতের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে

রাসূল (স) প্রথম দিন থেকে মানুষকে যেদিকে আহ্বান করেছেন, যা কিছু তাদের শুনিয়েছেন এবং যা কিছু তাদের নিকট পৌছিয়েছেন, সেগুলোর সম্পর্ক কায়েম করেছেন তিনি নিজের রবের সাথে। মহান আল্লাহর সাথে। তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন ইসলামী দাওয়াতের মূলকথা হচ্ছে এই যে, মানুষের গোটা জিন্দেগীতে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। সঠিক পথের দিশা (হেদায়াত) কেবল তিনিই দিতে পারেন।[১] যদিও কুরআনের প্রতিটি শব্দ তিনি তাঁর নিজ মুখ দিয়েই শুনিয়েছিলেন। যদিও এমন কোনো প্রাকৃতিক সাক্ষ্য প্রমাণ ছিলো না যে, এসব বাণী তাঁর নিজের কথা নয় এবং দাওয়াত তাঁর নিজের দাওয়াত নয়, কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃ এবং অবিরামভাবে এ একই কথা বলে যাচ্ছিলেন যে, এ দাওয়াতের সম্পর্ক আমার নিজের সাথে নয়, বরঞ্চ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে। এতে এ দাওয়াত তার দা'য়ীর নামের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যাবে এ ভয় কেটে যায়। ভবিষ্যতের দাওয়াতদানকারীরাও আর এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হবে না যে, আমরা কোন্ ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা ও খেয়াল খুশীর প্রতি মানুষকে আহ্বান করছি।

---

১. সূরা আল আলাক ঃ ১-৫, সূরা ইউনুস ঃ ৩৫

এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব

সমস্ত মিথ্যা খোদার শ্রেষ্ঠত্ব খতম করে কেবল এক লা-শারীক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠাই ছিলো নবী পাক (স)-এর দাওয়াত ও আন্দোলনের বুনিয়াদী মাকসাদ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ একই উদ্দেশ্যে তিনি কাজ করেছেন। মুহূর্তের জন্যে এ উদ্দেশ্যকে তিনি ভুলে যাননি। তাঁর রবই তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছেন।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - المدثر : ٣

"আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।"

এখানে একথাটি মনে রাখা দরকার যে, ইসলামী দাওয়াতের জন্যে তিনি প্রাথমিক ও বুনিয়াদী এ দুটি বিষয়ের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। সাথে সাথে তিনি এদিকেও পুরোমাত্রায় লক্ষ্য রেখেছিলেন, যেনো এগুলো কেবল মতবাদই থেকে না যায়। কেবল চিন্তা-গবেষণা এবং দার্শনিক ধ্যান-ধারণার মধ্যেই সীমিত না থাকে। কেবল বক্তৃতা বিবৃতির সীমার মধ্যেই আটকা না পড়ে যায়। বরঞ্চ এগুলো যেনো প্রতিটি মুহূর্তে লোকদের ধ্যান-ধারণা, মন-মগজ, কথাবার্তা এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ডে চালু হয়ে যায় এবং তরতাজা হয়ে থাকে। তখনকার একেকজন মু'মিনের জিন্দেগীতো ছিলো রাসূল (স)-এর একেকজন অনুগত মুজাহিদের জিন্দেগী। তিনি তাঁর একেকজন মুজাহিদের জিন্দেগীর সাথে "বিসমিল্লাহ" এবং "আল্লাহু আকবার"কে যেভাবে একাকার করে দিয়েছিলেন তা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি কতোটা প্রভাবশালী এবং সুদূর প্রসারী ছিলো। তেমনি তিনি এদিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন, যাতে করে দাওয়াতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ এবং শিক্ষাগুলোও যেনো তাদের জীবনে মজবুত হয়ে যায় এবং প্রতি মুহূর্তে তাদের সম্মুখে তরতাজা হয়ে থাকে। আবার এসব বিষয়ের মধ্যে তাওহীদ, রিসালাত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিষয়টা ছিলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠার এ পথে রাসূল (স) কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

ক. আল্লাহর বন্দেগীর প্রাধান্য

এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিলো এই যে, তিনি মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলারই দাসত্ব ও আনুগত্য করা এবং কেবলমাত্র তাঁরই হুকুম মেনে চলার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মুহূর্তের জন্যে তিনি

এ বিষয়টি থেকে গাফিল হননি। অথচ এর পরে সকল প্রকার অধ্যায়েরই আগমন ঘটেছে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। সামাজিক সংশোধনের কাজ করা হয়েছে। তরবারি উত্তোলন করা হয়েছে। গণীমতের মাল সংগ্রহ করা হয়েছে। কাফিরদের সাথে সন্ধি হয়েছে, যুদ্ধ হয়েছে, চুক্তি হয়েছে। কিন্তু সর্ব মুহূর্তে সেই বুনিয়াদী দাওয়াতই ছিলো সম্মুখে ভাস্বর ঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ـ الانعام : ١٠٢

"এ-ই হচ্ছেন আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সকল কিছুর তিনি সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁরই দাসত্ব ও বন্দেগী করো।"–সূরা আল আনআম ঃ ১০৩

কখনো পরম প্রাণাকর্ষী ভংগিতে একথাটিই বলেন ঃ

فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ ـ الذاريت : ٥٠

"অতএব তোমরা দৌড়ে এসো আল্লাহর দিকে।"–সূরা যারিয়াত ঃ ৫০

রাজা বাদশাহর নিকট যখন চিঠি লিখতেন তখন এটাই থাকতো মুখ্য দাওয়াত। ইহুদীদের নিকট এ জিনিসেরই তিনি দাবী করেছেন। নাজরানের খৃষ্টানরা এলে সকল প্রাসংগিক কথা বাদ দিয়ে তিনি এ মূল দাওয়াতই তাদের দিয়েছেন ঃ

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط ـ ال عمران : ٦٤

"এমন একটি কথার দিকে এসো, যেটি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। কথাটি হচ্ছে এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবো না। তার সাথে কাউকেও শরীক করবো না। আর আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকেও নিজেদের রব হিসেবে গ্রহণ করবো না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪

মুসলমানরা একটি উম্মাহ্ এবং মজবুত সংগঠিত শক্তির রূপ লাভ করার পর তাদের উপর জিহাদ এবং শাহাদাতে হকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এ দায়িত্বের ফরমানও জারি করা হয় এভাবে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ ...... وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ...... وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ - الحج : ٧٧-٧٨

"হে ঈমানদার লোকেরা! রুকূ' কারো, সিজদা করো এবং নিজেদের রবের বন্দেগী করো .... আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করা উচিত .... এবং তোমরা যেনো সমস্ত মানুষের উপর সাক্ষ্য হও।"–সূরা আল হজ্জ ঃ ৭৭-৭৮

একারণেই কুরআন নবী করীম (স)-এর দায়িত্ব ও পদমর্যাদাকে "দা'য়ী ইলাল্লাহ" বলে আখ্যায়িত করেছে।

খ. মিথ্যা খোদাদের বিরুদ্ধে জিহাদ

দ্বিতীয় বিষয়টি ছিলো এই যে, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর দিকে আহবানের কাজ প্রাধান্য পেয়েছে। আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মানুষ খোদা বানিয়ে নিয়েছিলো কিংবা যেসব লোক নিজেরাই খোদা হয়ে বসেছিলো এবং যেসব শক্তি এবং প্রতিষ্ঠান আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, এসকলেরই সমালোচনা করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। এদের কারো কাজে তিনি অংশও নেননি এবং কারো সাথে সমঝোতাও করেননি। এদের কাউকেও তিনি বৈধ বলেও স্বীকার করেননি। যদিও এসব কাজই সম্পন্ন হয়েছে হিকমতের সাথে, মানবিক জয্‌বার সাথে এবং নৈতিক আদর্শের সীমার মধ্যে অবস্থান করে। কিন্তু এর কোনো একটি কাজের মধ্যে সামন্যতম অবহেলাও করা হয়নি। তাঁদের সাথে তিনি সর্বপ্রকার উন্নত নৈতিক আচরণ করেছেন। কিন্তু সহ অবস্থান (Co Existance)-এ রাজী হননি। কারণ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ (আল্লাহর বন্দেগী করো) এর সাথে وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ (তাগুতদের থেকে সম্পর্কহীন হয়ে দূরে অবস্থান করো)-এর দাওয়াতও ছিলো। এর উপর তিনি পুরো মাত্রায় আমল করেছেন।

কুরআন এবং সীরাতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তাঁর দাওয়াতের এটাই ছিলো কর্মপন্থা। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা এজন্যে হন্তদন্ত হয়ে তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগে যায়। তারা তাঁর বিরোধিতায় সংগঠিত হয়ে নিজেদের সমস্ত শক্তি তাঁর শত্রুতায় নিয়োজিত করে। কারণ এখানে কেবল তাদের পাথরের তৈরী মূর্তির প্রশ্নই জড়িত ছিলো না। কোথাও ছিলো বাপ দাদার নাম এবং তাদের ইয্‌যতের প্রশ্ন, কোথাও

ছিলো দীর্ঘকালের সংকীর্ণ গোত্রীয় দলাদলি সামাজিক রসম রেওয়াজ। কোথাও সোসাইটি এবং কালচারের ভূত। কোথাও ছিলো বংশ বর্ণের প্রশ্ন। কোথাও ছিলো জাতীয়তাবাদী ঝগড়া বিবাদের প্রশ্ন। কোথাও জড়িত ছিলো কামনা বাসনা এবং আত্মার দাসত্বের প্রশ্ন। কোথাও জড়িত ছিলো ধনসম্পদের প্রশ্ন। কোথাও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন, কোথাও ছিলো নেতৃত্বে আর কোথাও ছিলো জ্ঞান ও তাকওয়ার প্রশ্ন। মূর্তিপূজার (Idolatry) ধরন যা কিছুই ছিলো না কেন, নবী পাক (স) তার প্রতিটির উপর আঘাত হেনেছেন। আর এ কারণেই তারা সকলে মিলে তাঁর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগে যায় ঃ

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ○وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ط اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ○- ص : ٥-٦

"সে কি সমস্ত খোদার পরিবর্তে একজন মাত্র খোদা বানিয়ে নিয়েছেন ? এতো বড়ই অদ্ভূদ ব্যাপার ! আর জাতির সর্দাররা একথা বলতে বলতে বের হয়ে গেলো ঃ চলো, নিজেদের মাবুদদের উপাসনায় অবিচল হয়ে থাকি। একথাটি অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে।"–সূরা সোয়াদ ঃ ৫-৬

গ. দাওয়াতের হেফাযত

তৃতীয় বিষয়টি ছিলো এই যে, নবী পাক (স) কখনো নিজ দাওয়াত ও মাকসাদের মধ্যে কোনো প্রকার রদবদল ঘটাননি। কোনো প্রকার কমতি করেননি। কোনো প্রকার বৃদ্ধি করেননি। তাঁর দাওয়াত ও মাকসাদের অন্তরাত্মায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। রূপ আকৃতি বিকৃত হয়নি। এ ব্যাপারে তাঁর উপর বাইরের চাপ এসেছে। ভিতরের চাপ এসেছে। বহির্মূখী চাপের ইংগিত পাওয়া যায় আবু তালিবের ঘটনায়। আবু তালিবের মাধ্যমে যখন এ দাবী করা হলো যে, আপনি অবশ্যি আপনার এক খোদার ইবাদাত করবেন। কিন্তু আপনার বিরোধীদের মা'বুদদের বিরুদ্ধে দাওয়াত ও জিহাদের কাজ পরিত্যাগ করবেন। সাধারণভাবে তারা এ দাবী করতো যে, আমাদের মূর্তিগুলোকে মন্দ বলা পরিত্যাগ করুন। কিন্তু এটা সবারই জানা কথা, নবী পাক (স)-এর পবিত্র যবান দিয়ে কখনো কোনো গালি বের হয়নি। মূলত তাদের 'মন্দ বলা পরিত্যাগ করুন'–কথার অন্তরালে সহ-অবস্থানের (Co-Existance) দাবীই নিহিত ছিলো। তারা যেনো

বলছিলো ঃ আপনি প্রাণ খুলে নিজ খোদার বন্দেগী করুন। অন্যদের খোদয়ীতে আঘাত হানবেন না। ঐ ঘটনায়ও বহির্মুখী চাপের ইংগিত পাওয়া যায়, যাতে তাঁকে অঢেল ধনসম্পদ, সুন্দরতম নারী এবং বাদশাহী প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছিলো। তিনি তাদের প্রস্তাব স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। কুরআন মজীদে পরিষ্কারভাবে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপর ন্যস্ত দাওয়াতের মধ্যে কোনো প্রকার রদবদল করার অধিকার তাঁর নেই।

قَالَ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ط قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ج - يونس : ١٥

"যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা বলে ঃ এটার পরিবর্তে অপর কোনো কুরআন নিয়ে এসো। কিংবা এতেই কোনোরূপ পরিবর্তন সূচিত করো। (হে মুহাম্মাদ) তাদের বলো ঃ এটা আমার কাজ নয় যে. আমার পক্ষ থেকে তাতে কোনোরূপ রদবদল করে নেবো। আমিতো শুধু সেই অহীরই অনুসারী, যা আমার নিকট পাঠানো হয়।"–সূরা ইউনুস ১৫

আদর্শ ও নীতির উপর তিনি ছিলেন হিমালয়ের মতো অটল অবিচল। উদ্দেশ্য হাসিল এ পথে যতোই কঠিন ছিলো না কেন, তিনি কিন্তু নিজ দাওয়াত ও পয়গামের মধ্যে সামান্যতম রদবদল করতেও প্রস্তুত ছিলেন না। এক আল্লাহর সাথে সাথে অন্যান্য খোদাদের দাসত্ব-আনুগত্য বৈধ বলে মেনে নিতে তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও প্রস্তুত হননি। এক নেতার স্থলে অন্যান্যদের নেতৃত্বের স্বীকৃতি তিনি প্রদান করেননি। যেসব ধর্মীয় নেতা, ব্যবসায়ী এবং গোত্রপতি জাতির খোদা হয়ে বসেছিলো, নেতৃত্বে তিনি তাদের কারো কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব স্বীকার করেননি। মূলত এ পলিসি ছিলো কুরআনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক নির্দেশের বাস্তব রূপ। এর একটি নির্দেশ এই ছিলো যে, তাঁকে যে পয়গাম ও রিসালাত দেয়া হয়েছে তিনি তা হুবহু পৌছে দেবেন। আর দ্বিতীয় নির্দেশটি ছিলো এই যে, তিনি দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করবেন। পরিপূর্ণতা দান করবেন এবং এ পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না ঃ

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ط

- المائدة : ٦٧

"হে রাসূল! তোমার আল্লাহর নিকট থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের পর্যন্ত পৌছে দাও। তুমি যদি তা না করো, তবে পৌছে দেয়ার হক তুমি আদায় করলে না।"

-সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৭

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط۔

"এ দীনকে তোমরা কায়েম করো এবং এতে ছিন্নভিন্ন এবং পৃথক পৃথক হয়ে যেয়ো না। এ মুশরিকদের জন্যে একথা বড় কঠিন ও দুঃসহ হয়েছে যার দিকে (হে নবী) তুমি তাদের দাওয়াত দিচ্ছো।"–সূরা আশ শুরা ঃ ১৩

ঘ. দাওয়াতের সকল অঙ্গের প্রতি লক্ষ্যারোপ

চতুর্থত, রাসূল (স) দাওয়াতের বিভিন্ন অঙ্গ ও দিক বিভাগের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখতেন। প্রতিটি অংগকে তিনি জীবন্ত ও তরতাজা রাখতেন। আমি এখানে বিশেষভাবে তাঁর দাওয়াতের তিনটি দিকের কথা আলোচনা করবো। এক, ইনযার (اِنْذَارْ) । অর্থাৎ সতর্ক ও সাবধান করা। দুই, ক্ষমা চাওয়ার আহবান। অর্থাৎ তাওবা করা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের দাওয়াত। তিন, সুসংবাদ দান। সুসংবাদ দানকারী এবং সাবধানকারী হবার আলোচনা সূরা আহযাবের যে স্থানে করা হয়েছে, সেখানে রাসূল হিসেবে তাঁর আদর্শের বিভিন্ন দিক, তাঁর বিভিন্ন প্রকার মর্যাদা কিংবা তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য এবং কার্যাবলীর গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে, সুসংবাদ তাওবা এবং এস্তেগফারেরই সাথে সম্পর্কিত । এ তত্ত্ব কুরআনের অসংখ্য স্থানে আলোচিত হয়েছে।

১. সতর্কীকরণ

সতর্কীকরণের কাজ তিনি একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই আরম্ভ করেন। সূরা মুদ্দাসসিরেই তাঁর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ঃ قُمْ فَاَنْذِرْ বলে। তারপর গোটা কুরআনের অসংখ্য স্থানে একই কথার উল্লেখ হয়েছে। তাঁর এ কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলো খোদায়ী হেদায়াত বিমুখীতা, খোদাদ্রোহিতা, অহংকার এবং অহংকারীদের অনুসরণের পরিণাম সম্পর্কে সতর্কীকরণ। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, প্রথমত তিনি এসব পরিণাম পরিণতির কথা বলতে গিয়ে পার্থিব এবং পারলৌকিক উভয় ধরনের পরিণামের কথাই বলেছেন। উভয়টার প্রতিই গুরুত্ব প্রদান

করেছেন। সাথে সাথে মানুষের মনোযোগ ও চিন্তাকে পরকালীন পরিণামের উপর কেন্দ্রীভূত করে দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, এটাই আসল এবং চিরস্থায়ী পরিণাম। দ্বিতীয়ত, একাজ কেবল ধমক প্রদান এবং ভয় দেখানো পর্যন্তই সীমিত ছিলো না বরঞ্চ আধুনিককালের পরিভাষা অনুযায়ী বললে কথাটা এভাবেই বলতে পারি যে, সতর্কীকরণের কাজে তিনি Critique এবং তার Empirical ও Theoretical উভয় প্রকার দলিল প্রমাণই প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে এর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

২. ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান

তাওবা এবং ইস্তেগফারের দাওয়াতও তাঁর দাওয়াতী কাজের বুনিয়াদী অংগ ছিলো। এ দুটো জিনিসের উপর যতোটা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যতোটা Stress দেয়া হয়েছে এবং এগুলোর জন্যে যে বিরাট সাফল্য ও সুসংবাদের ওয়াদা করা হয়েছে[১] তা থেকে একথারই প্রমাণ মেলে যে, এটা কেবল 'আস্তাগফিরুল্লাহর' তাসবীহ পড়ার দাওয়াত ছিলো না। বরঞ্চ এ ছিলো এক বিরাট উদ্দেশ্য হাসিলের দরখাস্ত।

নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা একথার স্বীকৃতি দান যে, আমরা বিশ্বজাহানের মালিকের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। তিনি জ্ঞান, শক্তি ও ইযযতের মালিক। তিনি হিসাব গ্রহণ করবেন। তিনি ইনসাফ করবেন। ইস্তেগফারের অর্থ এটাও যে, পরকালীন পরিণামফলই প্রকৃত পরিণামফল। কুরআন এবং হাদীসে এসবগুলোর দিক স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। নবী পাক (স) তাঁর শিক্ষাদান ও দাওয়াতী কাজে এসবগুলো দিকের প্রতিই গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

৩. সুসংবাদ দান

সুসংবাদ দানও ছিলো তাঁর দাওয়াতী কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এ সুসংবাদ দুনিয়া এবং পরকাল উভয়েরই সংগে সম্পর্কিত ছিলো। কিন্তু পরকালের পুরস্কারই যে প্রকৃত ও স্থায়ী পুরস্কার সে কথাও সাথে সাথে বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সত্যিকার ঈমানদার হলে একদিকে দুনিয়ায় তোমরা বিজয়ী হবে। তোমাদেরকে দুনিয়ার খেলাফত দানের ওয়াদা রয়েছে। আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা তোমাদের জন্যে খুলে দেয়া হবে। অপরদিকের সে জান্নাত লাভ করবে যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মতো। লাভ করবে ক্ষমা, রহমত, চিরস্থায়ী নিয়ামত শাশ্বত জীবন, খোদার সন্তোষ। এ ছাড়াও তোমরা যা চাইবে,

১. সূরা হুদ ঃ ৩, ৫২, ৬১, ৯০. সূরা নূহ ঃ ৪, ১৩. সূরা আলে ইমরান ঃ ৬, ১৩৩ ;

তা-ই পাবে এবং আল্লাহর ভাণ্ডারে আরো অনেক অনেক নিয়ামত রয়েছে, যা তিনি তোমাদের দান করবেন।[১] এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর সাথীদের যাবতীয় কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতাকে মজবুত, আবেগময় ও সজীব ছাঁচের মধ্যে ঢেলে প্রতিটি মুহূর্তে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন, যাতে করে এ জিনিসগুলো কেবল স্বীকৃত (Under stood) বিষয় হয়েই না থাকে। বরঞ্চ এগুলো যেনো তাদের মন মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। প্রতিনিয়ত আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্যে পর্যালোচনা ও আত্মসমালোচনা হয় এবং এসব প্রতিশ্রুতির প্রতি তারা পূর্ণ আস্থাবান হয়ে যায়। প্রতিটি কাজেই যেনো তারা এসব নিয়ামতের অন্বেষণ করে, চাই সেটা তরবারি উত্তোলনের কাজ হোক, দণ্ডবিধান হোক কিংবা অর্থদানের দাবী হোক। মোটকথা, এসব নিয়ামত লাভের আকাঙ্ক্ষা যেনো তাদের ধান্ধায় পরণত হয়ে যায়।

৬. বিন্যাস

পঞ্চম বিষয়টি ছিলো এই যে, নবী পাক (স) দাওয়াতের বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। প্রতিটি অঙ্গকে তার গুরুত্ব ও মেজায অনুযায়ী পূর্বাপর সাজিয়েছেন। এ বিন্যাসের মধ্যে কোথাও ছিলো বীজ ও ফলের সম্পর্ক। আবার কোথাও ছিলো ভিত, পিলার এবং অট্টালিকার কাঠামো। কোনো অঙ্গ ভিতের মর্যাদা পেয়েছে। কোনো অঙ্গ পেয়েছে সাজ সৌন্দর্যের মর্যাদা। কেননা দার্শনিকের মতো ধ্যান ধারণা পেশ করে দেয়া, একজন ওয়ায়েযের মতো উপদেশ দিয়ে দেয়া এবং একজন আহবায়কের মতো আহবান করে যাওয়াই শুধু তাঁর কাজ ছিলো না। বরঞ্চ তাঁর কাজ তো ছিলো একটি সুসংগঠিত সুশৃংখল উম্মাহ গঠন এবং সেই উম্মাহকে দাওয়াত, জিহাদ এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার যোগ্য ও উপযুক্ত করে তৈরী করা। এজন্য তিনি প্রতিষ্ঠানাদি নির্মাণ, সামাজিক সংগঠন তৈরী এবং খানকা কায়েমের কাজে আত্মনিয়োগ করেননি। তিনি সবসময় দীনি কাজে উদ্দেশ্য এবং আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করেছেন। মু'মিন হবার প্রকৃত মানদণ্ড বলে দিয়েছেন। কাজের স্তর যথার্থ বিন্যাস এবং প্রতিটি স্তরের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি দৃষ্টি রেখেছেন, প্রতিষ্ঠানাদি এবং আনুষ্ঠানিকতা যেনো উদ্দেশ্যের স্থান দখল না করে। এ সম্পর্কে কুরআনে অনেক আয়াত এবং বহু হাদীস রয়েছে। এ সম্পর্কে

১. দ্রষ্টব্য : সূরা আলে ইমরান : ১৩৯, সূরা আন নুর : ৫৫, সূরা আল মায়েদা : ৬৬ সূরা আল আরাফ : ৯৬, সূরা আত তাওবা : ২০, ২১৯

কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করাই যথেষ্ট, যাতে বলা হয়েছে إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ "অর্থাৎ তোমরা যদি সত্যিকার মু'মিন হও"। কুরআনের সেসব আয়াতও সকলের অধ্যয়ন করা উচিত, যেসব আয়াতে আলোচিত হয়েছে, কারা মু'মিন আর কারা মু'মিন নয়। এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো সকলের অধ্যয়ন করা উচিত। যথার্থ বিন্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে এখানে কুরআনের একটি আয়াত উদ্বৃত করে দিচ্ছি ঃ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَايَسْتَوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط ـ التوبة : ١٩

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণকে সেই ব্যক্তির কাজের সমান মনে করে নিয়েছো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং প্রাণপণ জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে ? আল্লাহর নিকট এই দুই শ্রেণীর লোক এক ও সমান নয়।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১৯

❑

৩. নবী পাক (স) এবং দাওয়াতে দীন

দাওয়াতের ব্যাপারে এ যাবত আমরা রাসূল (স)-এর আদর্শের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করলাম। এখান থেকে আরো সম্মুখে অগ্রসর হোন। দেখবেন, দাওয়াতের মর্যাদার সাথে তাঁর মন মানসিকতার সম্পর্ক, এর গুরুদায়িত্বের অনুভূতি, এর জন্যে তার অন্তরের ব্যাকুলতা, এর জন্যে তার ইল্‌মী, রুহানী, নৈতিক ও আমলী প্রস্তুতি এবং এ পথে তাঁর মানসিক অবস্থার এক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু রয়েছে। এ বিষয়ে কুরআন মজীদে বিস্তারিত আলোকপাত হয়েছে। সেখান থেকে আমরা কয়েকটি মাত্র মনিমুক্তা এখানে আহরণ করলাম।

গুরু দায়িত্বের অনুভূতি এবং সার্বক্ষণিক ধ্যান ও ব্যাকুলতা

দাওয়াত ইলাল্লাহ, শাহাদাতে হক এবং ইকামাতে দীনের কাজ খুবই জটিল এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু যিনি কাফেলার অধিনায়ক, তার জন্যে যে এ বিরাট যিম্মাদারীর বোঝা হাজার গুণ ভারী ও জটিল, তা বলাই বাহুল্য। কোনো ব্যক্তি যদি চাকুরী বা পেশা হিসেবে, কিংবা পরিস্থিতির চাপ বা মনের সান্ত্বনার জন্যে এ দায়িত্ব নিজ ঘাড়ে চেপে নেয়, তার পক্ষে এর সঠিক হক আদায় করা সম্ভব হতে পারে না। কোনো ব্যক্তির পক্ষে তখনই এ দায়িত্বের সঠিক হক আদায় করা সম্ভব, যখন সে এটাকে তার মালিকের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব মনে করবে।

কারণ, এ পথ বড় কঠিন। এর দাবীসমূহ খুবই জটিল। আর নেতাকেই সংকট ও জটিলতার মুকাবিলা সবচেয়ে বেশী করতে হয়। এ পথে তাকেই সবচেয়ে বেশী এবং পরিপূর্ণভাবে নিঃস্বার্থপরতা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অধিকারী হতে হয়। চরম উন্নত ও পবিত্র নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হয়। চরম বিরোধিতার মোকাবিলায় সবর অবলম্বন করা তার জন্য অপরিহার্য। অটল অবিচল হয়ে থাকা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। সফলতার কোনো সম্ভাবনা দেখা না গেলেও পূর্ণোদ্যমে তাকে নিজের কাজে লেগে থাকতে হয়। মন্দের জবাব দিতে হয় ভালো দিয়ে। গালির জবাব দিতে হয় হাসি দিয়ে। কাঁটা অতিক্রম করতে হয় হাসিমুখে। পাথর খেয়ে দোয়া করতে হয় হেদায়াতের। বিরোধীদের সাথে পর্যন্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং তাদেরকে ছোট ও নগণ্য মনে করার নীতি অবলম্বন করা যায় না। দুর্বল

ও অক্ষম সাথীদের নিয়ে দুর্গম পথের চড়াই উতরাই পাড়ি দেয়ার অসীম সাহসের অধিকারী তাকে হতে হয়। নীরবে হজম করতে হয় নিজ লোকদের সকল বাড়াবাড়ি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো দায়িত্ব পালনে সফলতা অর্জিত হওয়ার সাথে সাথে অহংকার ও আত্মগর্বের যে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, তা থেকে তাকে পুরোপুরি আত্মরক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে হয় কুরআনেরই বাস্তব রূপায়ণ। রাসূল (স) আরোহণ করেছিলেন এ সকল গুণাবলীর শির-চূড়ায়। আসলে এইতো ছিলো তাঁর মি'রাজ। তায়েফের কঠিন ময়দানে সফলতা অর্জন করার পরইতো তাঁর আসমানী মিরাজ সংঘটিত হয়। আরব ও আজমকে তাঁর পদানত করে দেয়া হয়।

রাসূল (স) যে দায়িত্ব পালন করছিলেন, যে পথে পাড়ি জমাচ্ছিলেন, তা যে আল্লাহরই পক্ষ থেকে অর্পিত, সে বিষয়ে তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিলো না। এ বিষয়ে তাঁর একীন ছিলো সমস্ত মানুষের উর্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। আমার মনে হয় সেরকম একীনের কাছাকাছিও কোনো মানুষ পৌঁছুতে পারে না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে কথা বলছিলেন। জিবরাইল আমীন (আ) তাঁর নিকট আগমন করছিলেন। তাঁর হৃদয় মুবারকের উপর অহী নাযিল হচ্ছিলো।

আমাদের উম্মতদের অংশতো শুধু এতোটুকুই, যা আমরা কুরআনের এ বাক্যগুলোর প্রতি একীনের ধরন থেকে লাভ করি। এ-ই আমাদের যথেষ্ঠ, আমরা যদি তা হুবহু লাভ করতে পারি।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ـ البقرة : ١٤٣

"আর এভাবেই আমরা তোমাদের (মুসলমানদের)-কে একটি মধ্যম পন্থানুসারী উম্মত বানিয়েছি, যেনো তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হও।"—সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ ـ الصف : ١٤

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও।"—সূরা আস সফ ঃ ১৪

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ ـ البقرة : ٢٤٥

"তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে প্রস্তুত ? তাহলে আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বেশী ফিরিয়ে দেবেন।" –সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৫

কুরআন মজীদে যেসব স্থানে নবী (স)-কে সম্বোধন করে فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ। (তুমি সন্দেহ পোষণকারী হয়ো না) বলা হয়েছে, সেসব স্থানে সম্বোধনের অন্তরালে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিই রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

ক. আল্লাহর কাজ মনে করার ধরন

নবী পাক (স) তাঁর সকল কাজ এ অনুভূতি ও আস্থার সাথেই আঞ্জাম দিয়েছেন যে, এ হচ্ছে আল্লাহর কাজ। কুরআন যখন অবতীর্ণ হতো তখন এ আস্থাকে আরো গভীর ও দৃঢ়তর করার জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা হতো। তাঁর মধ্যে স্বচ্ছ বুঝ সৃষ্টি করে দেয়া হতো যে, এ অহী আল্লাহর নিকট থেকেই নাযিল হচ্ছে। আপনি সত্য এবং সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর রয়েছেন। অবশ্যি আপনি রসূলদের অর্ন্তভুক্ত। এভাবে তাঁর সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আস্থা-একীন বৃদ্ধি পেতো। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি মুহূর্তেই এ জিনিসটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হতো। কারণ এ অনুভূতির মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিলেইতো বিকৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। বস্তুত যখনই এ অনুভূতিতে দুর্বলতা দেখা দেয়, তখন বিকৃতি অবশ্যি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কেউ যদি নবী পাকের চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে এক শব্দে প্রকাশ করতে চায়, তবে সে শব্দটি হলো 'সবর'। সংকীর্ণ অর্থ নয় বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ হিসেবেই আমি তার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করতে চাই। আর তাঁর সমস্ত সবর ছিলো তার রবেরই উদ্দেশ্যে যেহেতু তাঁর সমস্ত কর্মতৎপরতাও তাঁর রবেরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ - المدثر : ٧

"আর তোমার রবেরই উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করো।"

খ. মালিকের তত্ত্বাবধানে

এ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূল (স) তাঁর সমস্ত কাজ সেই মালিকের সম্মুখে এবং তত্ত্বাবধানেই সম্পাদন করছিলেন, যিনি তাঁকে এ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি ছিলেন তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তিনি সবকিছু শুনছিলেন, দেখছিলেন, যা কিছু বিরোধিরা বলছিলো এবং

করছিলো। যা কিছু তাঁর সঙ্গী-সাথীরা বলছিলো এবং করছিলো। আর যা কিছু স্বয়ং তিনি করছিলেন এবং বলছিলেন।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا ـ الطور : ٤٨

"(হে নবী!) তোমার রবের চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত তুমি সবর করো। তুমিতো আমারই দৃষ্টি পথে রয়েছো।"–সূরা আত তূর : ৪৮

اِنَّنِيْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى ـ طه : ٤٦

"আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। সবকিছু শুনছি এবং দেখছি।"
–সূরা তোয়াহা : ৪৬

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط ـ الحديد : ٤

"তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন।"–সূরা আল হাদীদ : ৪

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ٥ ـ ق : ١٦

"আমরা তার গলার শিরা থেকেও অধিক নিকটবর্তী।"–সূরা ক্বাফ : ১৬

لاَتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ التوبة : ٤٠

"ভীত হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।"-সূরা তাওবা : ৪০

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ـ المجادلة : ٧

"তিনজনের মধ্যে কোনো পরামর্শ হলে আল্লাহ্ থাকেন তাদের চতুর্থ জন।"–সূরা আল মুজাদালা : ৭

আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে আমাদের সামনে যে অবস্থা প্রতিভাত হচ্ছে, তার দুটি দিক রয়েছে। একদিকে রয়েছে সান্ত্বনা, প্রশান্তি, আস্থা, তাওয়াক্কুল, সাহস, নির্ভয়, যোশ-আবেগ এবং প্রতি মুহূর্তে নব উদ্দীপনা লাভের অসীম ভাণ্ডার। এর এক সোনালী উপমা হচ্ছে 'সওর' গুহার ঘটনা। বস্তুত নবীপাকের গোটা জিন্দেগীই এসব ঘটনায় ভরপুর। তেইশ বছরের নবুওয়াতী জিন্দেগীতে একটি মুহূর্ত এরূপ ছিলো না, যখন তাঁর মধ্যে মানসিক স্থবিরতা এসেছে। যখন আবেগ উদ্দীপনায় জড়তা এসেছে। কিংবা তিনি হিম্মত হারা হয়েছেন।

আর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে দায়িত্বের মর্যাদা এবং নাজুকতা উপলব্ধির ভাণ্ডার। কার কাজ করা হচ্ছে ? এ চিন্তা কাজের মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ

করে তোলে। কেউ যখন উপলব্ধি করে, সে যে কাজ করছে, স্বয়ং আল্লাহ তা দেখছেন। তখন তার মনমানিসকতা যিম্মাদারীর তীব্র চেতনা থেকে কী করে মুক্ত থাকতে পারে ? আসলে সে মালিকের শ্রেষ্ঠত্বকে যতো বেশী বড় করে উপলব্ধি করতে পারবে। তাঁর কাজকেও তাতোই শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাব্যাঞ্জক বলে অনুভব করতে সক্ষম হবে।

গ. মর্যাদা ও যিম্মাদারীর অনুভূতি

নিজ কাজের মর্যাদা এবং যিম্মাদারীর ওজন ও নাজুকতা সম্পর্কে নবী পাক (স) সবসময়ই সজাগ ছিলেন। অহী এলেই তাঁর মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হতো। কম্পন সৃষ্টি হতো মনে এবং দেহেও। অহী নাযিল হলে হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট এলেন। এসেই বললেন زَمِّلُوْنِىْ "আমাকে চাদর আচ্ছাদিত করো।" يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ এবং يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে কুরআন অন্যান্য অবস্থার সাথে সাথে তাঁর এ অবস্থাটির প্রতিও এখানে ইংগিত করেছে।

সম্মুখে তাঁর এক অতিবিরাট কাজ, মহান দায়িত্ব। এর ভয় মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। ঘনকালো অন্ধকারে নূরের একটি আভা। একে আলোকময় করতে হবে। কয়েকটি শব্দের একটি আহ্বান। এদিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে সমস্ত শ্রোতাকে। ছোট একটি বীজ। একে বপন করে এমন এক গাছে রূপান্তরিত করতে হবে। যার শিকড় মাটিকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছে আর শাখা প্রশাখা উম্মেলিত হয়েছে ঊর্ধাকাশে। যে সবসময় ফলদান করে। যার ফল এবং ছায়া দ্বারা উপকৃত হয় কাফেলার পর কাফেলা। সুতরাং মনে যে অশ্বস্তি ছিলো, দিলের যে হতাশা ছিলো, দায়িত্বের যে পাহাড় নযরে আসছিলো, চাদর আচ্ছাদিত হবার অবস্থা দ্বারা কুরআন এসব কিছুর পরিবর্তন করে দিয়েছে।

সাথে সাথে তিনি একথাও অনুধাবন করে নিয়েছিলেন, দাওয়াতে হকের অর্থ এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব মানে হাচ্ছে, পা ছড়িয়ে শোবার দিন বিগত হয়েছে। এখন কোমর বেঁধে নিজেকে তৈরী করতে হবে। একাজ অবিরতভাবে করতে হবে। ময়দানে দাঁড়িয়ে বীরত্বের সাথে গোটা দুনিয়াকে সাবধান ও সতর্ক করার কাজ এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রানান্তকর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হবে। লেগে থাকতে হবে।

ঘ. দুর্বহ কালাম

রাসূল (স)-এর প্রতি ইকরা (اِقْرَاْ)-র যে পয়গাম এসেছিলো, তাতো কেবল জ্ঞান রাজ্যে পরিভ্রমণের আহ্বানই ছিলো না, বরঞ্চ তা ছিলো এক

দুর্বহ কালাম। দাওয়াত এবং হিজরত ও জিহাদের কঠিন স্তরসমূহ পাড়ি দেয়ার নির্দেশ ছিলো এ দুর্বহ কালামের অন্তর্ভুক্ত। কেবল তিলাওয়াত এবং সওয়াব হাসিল করার জন্যে অহী নাযিল হয়নি। বরঞ্চ এ ছিলো দায়িত্বের এক দুর্বহ বোঝা। এটা কেবল ভাব ও অন্তর্গত বোঝাই ছিলো না, বরঞ্চ দৈহিক বোঝাও বটে। অহী যখন অবতীর্ণ হতো তাঁর কপাল মুবারকে ফোটা ফোটা ঘাম জমা হয়ে উঠতো।

এ সময় তিনি সওয়ারীতে উপবিষ্ট থাকলে সওয়ারী দুর্বহ চাপে বসে পড়তো। কুরআন পাকে একথাই স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে।

اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً○ - المزمل : ٥

"আমরা তোমার প্রতি এক দুর্বহ কালাম নাযিল করতে যাচ্ছি।"
—সূরা আল মুযযাম্মিল ঃ ৫

তাঁর জন্য এটা কোনো খেল তামাশার কালাম ছিলো না, বরঞ্চ এ ছিলো এমন এক মিশন যা গোটা জিন্দেগীর সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত ছিলো যে, তা তাঁর কোমর ভেংগে দিচ্ছিল। যে বোঝা কেবল পরম করুণাময়ের অনুগহে কিছুটা হালকা হতে যাচ্ছিলো।

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ○الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ○ - الم نشرح : ٢-٣

"আর আমি তোমার উপর থেকে সেই দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি যা তোমার কোমর ভেংগে দিচ্ছিল।"—সূরা আলাম নাশরাহ ঃ ২-৩

শাহাদাতে হকের দায়িত্বানুভূতি এক দুর্বহ বোঝার মতো সবসময় তাঁর হৃদয় মুবারকের উপর চেপে থাকতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী একবার নবী পাক (স) তাকে কুরআন তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দেন। প্রথমে তিনি এ ভেবে অনেকটা ঘাবড়ে যান যে, যার প্রতি অহী নাযিল হয়েছে, তাঁকে আমি কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাবো ? অতপর নবী (স) পুনরায় নির্দেশ দিলে তিনি সূরা আন নিসার কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে শুনান। তিলাওয়াত করতে করতে যখন তিনি—

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا○ -

"অতপর চিন্তা করো, আমি যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করবো এবং এ সমস্ত সম্পর্কে তোমাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করবো, তখন তারা কি করবে।"—সূরা আন নিসা ঃ ৪১

–এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন আওয়ায এলো আবদুল্লাহ থামো!

হযরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি তখন মাথা উঠিয়ে দেখি তাঁর দুচোখ থেকে অশ্রু বিগলিত হচ্ছে।

ঙ. সার্বক্ষণিক ধ্যান ও পেরেশানী

অর্পিত কাজের বিরাটত্ব এবং গুরুদায়িত্বের তীব্র চেতনা ও অনুভূতির ফলশ্রুতি এই ছিলো যে, দাওয়াত ও আন্দোলনের পজিশনকে তিনি একটি জুব্বার মতো মনে করতে পারছিলেন না, যা পরিধান করে সানন্দে চলা ফেরা করা যায়। বরঞ্চ একাজ তাঁর সার্বক্ষণিক ধ্যান ও পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। একাজ অন্তরের নিভৃত ঘরে স্থান করে নিয়েছিলো। হৃদয়ের গভীরতায় শিকড়ের জাল বিস্তার করে নিয়েছিলো। প্রতিটি মুহূর্ত এ ধ্যান তাঁর হৃদয় মনকে পেরেশান করে রাখছিলো। সকাল সন্ধ্যা এই ছিলো তাঁর যিকির। এ ছিলো ফিকির। এ ছিলো বিজনেস। এ কাজের প্রতিটি দাবীর জন্য তাঁর অবস্থা এরূপ ছিলো। সর্বাধিক পেরেশানী ছিলো দাওয়াতের জন্য। এজন্যে তাঁর হৃদয়ে ছিলো এক অবর্ণনীয় দরদ। মানুষের কল্যাণ কামনায় সদা উদ্বেলিত ছিলো তাঁর হৃদয় মন। তাঁর কামনা ছিলো, সকল মানুষ হিদায়াতের নূরে উদ্ভাসিত হোক। তারা সত্য উপলব্ধি করুক। সঠিক পথের অনুসারী হোক। তাঁর হৃদয়ের এ ধ্যান, এ পেরেশানী, এ উদ্বেলিত কামনা, এ বেদনা ও অশ্বস্তির চিত্র কুরআন মজীদ এভাবে অংকন করেছে।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ٥- الشعرى : ٣

"(হে নবী!) এ লোকেরা ঈমান আনছে না, এ চিন্তায় তুমি হয়তো তোমার প্রাণটাই বিনষ্ট করবে।"–সূরা আশ শোয়ারা ঃ ৩

এ চিন্তা, এ ধ্যান, এ পেরেশানীতে তিনি নিজের জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছিলেন। মানুষের হেদায়াতের জন্যে এমন ব্যাকুলতা ছাড়া কোনো অবস্থাতেই ইসলামী আন্দোলন চলতে পারে না।

নবী পাকের এ ব্যাকুলতার জন্যে কুরআন মজীদকে বারংবার তাঁর আস্তীন টেনে ধরতে হয়েছে। তাঁকে বুঝাতে হয়েছে, প্রতিটি মানুষকে ঈমানের আলোতে উদ্ভাসিত করা আপনার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। আপনাকে দারোগা, উকিল এবং ফিল্ড মার্শাল বানিয়ে পাঠানো হয়নি। দাওয়াত পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে আপনার মৌলিক দায়িত্ব। মানা বা না মানা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ব্যাপার। জীবনপথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা

প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে। কুরআনের এ ধরনের আয়াতসমূহ মূলত নবী (স)-এর পেরেশানী এবং ব্যাকুলতার অবস্থাও প্রকাশ করছে। দা'য়ীয়ে হকের পজিশনও নির্দেশ করছে এবং নেতা ও শিক্ষক হিসেবে তাঁর কাজের পরিধির প্রতিও ইংগিত করছে।

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

"(হে নবী!) তুমি কি এমন বধির লোকদের শুনাবে ? কিংবা অন্ধও সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত লোকদের পথ দেখাবে ?"
–সূরা আয্ যুখরুফ : ৪০

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ج ـ القصص : ٥٦

"(হে নবী!) তুমি যাকে চাইবে, তাকে হিদায়াত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।"–সূরা কাসাস : ৫৬

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ ـ النحل : ٣٧

"(হে নবী!) এদের হিদায়াতের জন্যে তুমি যতোই লালায়িত হওনা কেন, কিন্তু আল্লাহ যাকে গোমরাহ করে দেন তাকে তিনি আর হেদায়াত দেন না।"–সূরা আন নহল : ৩৭

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ط قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ○ـ الانعام : ٦٦

"তোমার জাতি একে অস্বীকার করছে অথচ এ হচ্ছে প্রকৃত সত্য। তাদের বলো আমি তোমাদের উপর 'হাবিলদার' নিযুক্ত হয়ে আসিনি।"–সূরা আল আনয়াম : ৬৬

স্বীয় প্রস্তুতি

নবী পাক (স) প্রথম দিন থেকে যখন কালামে পাকের তাবলীগ, দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজ আরম্ভ করেন, সে মুহূর্ত থেকেই স্বীয় প্রস্তুতির কাজও তিনি আরম্ভ করেন। এ ছিলো এক সার্বিক ও পূর্ণাংগ প্রস্তুতি। এ প্রস্তুতির কয়েকটি দিক আমরা এখানে আলোচনা করছি :

ক. কুরআনের সাথে নিবীড় সম্পর্ক

এ সার্বিক প্রস্তুতির শিরোমণি ছিলো কুরআন মজীদ। এ কালাম তাঁরই প্রতি নাযিল হচ্ছিল। তিনি তা লাভ করছিলেন। তা অনুধাবন করছিলেন। তা নিয়ে গভীর চিন্তা গবেষণা করছিলেন। তার মধ্যকার ইলমের ভাণ্ডার তিনি অর্জন করছিলেন। এ পূর্ণাঙ্গ কালামকে তিনি হৃদয়ের মধ্যে ধরে

রাখছিলেন। প্রাণের চেয়ে ভালো বাসছিলেন। তার মধ্যে আত্মা নিমগ্ন করছিলেন এবং তার ছাঁচে নিজেকে ঢেলে গড়ছিলেন।

এ দিকে তাঁর ইলমী, রূহানী এবং নৈতিক প্রস্তুতির জন্যে এ ছিলো এক অপরিহার্য কাজ। অপরদিকে রিসালাত, দাওয়াত ও আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের কেন্দ্রবিন্দুও ছিলো এ কুরআনই। এর আয়াতের তিলাওয়াত, এর শিক্ষা প্রদান, হিকমতের প্রশিক্ষণ এবং মানুষের তাযকিয়া করাইতো ছিলো তাঁর মৌলিক কাজ।

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝ - البقرة : ١٥١

"আমি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যিনি আমার আয়াত তিলাওয়াত করে তোমাদের শুনান। তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন। আল-কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা প্রদান করেন এবং সেসব জিনিসের তালীম দেন যা তোমরা জানতে না।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৫১

কুরআন মজীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক জোর-জবরদস্তির সম্পর্ক ছিলো না। বরঞ্চ এ ছিলো প্রবল আকর্ষণ ও মহব্বতের সম্পর্ক। কারণ এখান থেকেই তাঁর যাবতীয় তৎপরতার রস সিঞ্চিত হতো। কুরআনের প্রতি তাঁর মহব্বত ও প্রবল আকর্ষণের বিষয়ে অহীর বক্তব্য হচ্ছে ঃ

لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝ - القيمة : ١٦

"(হে নবী!) এ অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্ত করার জন্য নিজের জিহ্বাকে আন্দোলিত করো না।"-সূরা আল কিয়ামা ঃ ১৬

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী লিখেছেন ঃ

এ সময়ে নবী করীম (স)-এর মধ্যে মহব্বত ও আকর্ষণের যে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিলো তার চিত্র ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। অহী অবতীর্ণের দীর্ঘ বিরতীকালের অস্থির অপেক্ষার পর বিরুদ্ধবাদীদের চরম হঠকারিতার তুফানের মধ্যে যখন হযরত জিবরাঈল (আ) আরশের মালিকের পয়গাম নিয়ে হাজির হতেন, তখন তার মনের মধ্যে মহব্বত ও আকর্ষণের যে ভাব সৃষ্টি হতো তা কি ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব ? এ যেনো

ক্ষুধা, তৃষ্ণায় অস্থির এক শিশু। তার মা তাকে বুকে নিয়ে স্তনের বোঁটায় মুখ লাগাতেই মায়ের বুকের সমস্ত দুধ সে যেনো এক নিঃশ্বাসেই পান করতে চায়। ক্ষরাতপ্ত মরুপথের কোনো মুসাফির ছাতি ফাটা তৃষ্ণার দীর্ঘপথ পেরিয়ে ঠাণ্ডা মিষ্টি পানির কলসী যদি হাতের কাছে পেয়ে যায়, তার যেমন ইচ্ছা করে কলসের সমস্ত পানিটুকুই এক নিঃশ্বাসে পান করে নেয়ার। তেমনি দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যদি কেউ নিজ মাহবুবের (প্রিয়তমের) পত্র লাভ করে, তখন তার ব্যাকুল প্রাণের আকুল আকর্ষণী দৃষ্টির একই পলকে যেনো পত্রের সবগুলো কথা পড়ে নিতে চায়।[১]

খ. জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা

আল্লাহর নির্দেশ আসার পর অহী মুখস্তের জন্যে ত্বরিত জিহ্বা সঞ্চালন তো নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায় বটে। কিন্তু মনের আকর্ষণ আর ব্যাকুলতা তো থেকে যায় অদম্য। এ আকর্ষণ আর ব্যাকুলতার প্রকাশ ও পূর্ণতার জন্যে পবিত্র জবানীতে জ্ঞানে গভীরতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে ঃ

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ○ - طه : ١١٤

"আর দোয়া করো ঃ পরওয়াদেগার ! আমাকে অধিক ইল্‌ম দান করো।"-সূরা ত্ব-হা ঃ ১১৪

দাওয়াতে দীনের সম্মুখে রয়েছে যে মনযিল, অহীর শিক্ষায়তনে জ্ঞানার্জন ছাড়া তা ল্যাভ করা যেতে পারে না। জ্ঞান ও ইল্‌মের প্রাচুর্য ছাড়া একাজ হতে পারে না। এজন্যে প্রয়োজন মন-মানসিকতা ও চিন্তা ভাবনার ব্যাপক যোগ্যতা। প্রয়োজন হিকমতের পূর্ণ ভাণ্ডার। রাসূল (স) এ ইল্‌ম ও হিকমাত কুরআন মজীদ থেকেই লাভ করেছেন। এরি ভিত্তিতে তিনি মানুষের জন্য তৈরী করেছেন জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদ। একজন নেতার মধ্যে ইল্‌মের প্রতি যে পরিমাণ আকর্ষণ ও ব্যাকুলতা থাকা প্রয়োজন, তার মধ্যে শুধু তাই ছিলো না, বরঞ্চ এ ব্যাপারে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন আরশের মালিকের দিকে। তাঁরই নিকট দোয়া প্রার্থনা করেছেন। তাঁরই প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। নির্ভর করেছেন তাঁরই উপর। কারণ, জ্ঞান ও হিকমাতের উৎসতো তিনিই।

অতপর কুরআনের যে অংশ যখনই তিনি লাভ করতেন, সাথে সাথে সেটাকে তিনি নিজ রূহের খোরাক বানিয়ে নিতেন। বস্তুত কুরআন ধীরে

১. তাদাব্বুরে কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড (লাহোর), পৃষ্ঠা ঃ ৮৫

ধীরে অল্প অল্প নাযিল হবার মধ্যে এটাই ছিলো হিকমত। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ছিলো তাঁর এ কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত।

গ. কিয়ামুল লাইল ও তারতীলুল কুরআন

এর পন্থা কি ছিলো ? প্রথম প্রথম বিছানার আরাম ছেড়ে রাতের অধিকাংশ সময় তিনি হাত বেঁধে কুরআনের মনযিলের সামনে দাঁড়িয়ে যেতেন। এমনটি করতেন তিনি কখনো অর্ধেক রাত। কখনো তার চেয়ে বেশী। কখনো তার চেয়ে কম। কখনো এক তৃতীয়াংশ। কখনো দুই তৃতীয়াংশ। আর তিলাওয়াত করতেন কুরআন পাক। ধীরে ধীরে। বুঝে বুঝে। মর্ম উপলব্ধি করে। জবান ও হৃদয়ের গভীরতম ঘনিষ্টতায়। কুরআনকে আত্মস্থ করার, আপন সত্ত্বায় একাকার করার এর চেয়ে কার্যকর কোনো পন্থা হতে পারে না।

قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً ○ نِصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً ○ اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً .... اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ ـ المزمل : ٢ـ٤ ، ٢٠

"রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকো কিন্তু কম। অর্ধেক রাত কিংবা তা থেকে কিছুটা কম করে নাও। অথবা তা থেকে কিছু বেশী বৃদ্ধি করো। আর কুরআন পড় থেমে থেমে। .... হে নবী, তোমার রব জানেন যে, তুমি কখনো রাতের দুই-তৃতীয়াংশ সময়, কখনো অর্ধেক রাত আবার কখনো এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদাতে দাঁড়িয়ে থাকো।"

—সূরা আল মুয্যাম্মিল ঃ ২-৪, ২০

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ পন্থা থেকে তিনি বিরত থাকেননি। এমনকি শেষ বয়সে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার পা ফুলে যেতো। এছাড়াও তিনি সবসময় কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। রমযান মুবারকে গোটা কুরআন শরীফ খতম করতেন। সাধারণত ফজর নামাযে দীর্ঘ কিরাত পড়তেন।

اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط ـ العنكبوت : ٤٥

"(হে নবী!) তিলাওয়াত করো সেই কিতাব যা অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো হয়েছে আর সালাত কায়েম করো।"

—সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৫

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ○ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ق عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا○ - بنى اسراء يل : ٧٨-٧٩

"নামায কায়েম করো সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার আচ্ছন্ন হবার সময় পর্যন্ত। আর ফজরের কুরআন পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন করো। কেননা ফজরের কুরআনে উপস্থিত থাকা হয়। আর রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ো। এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত। অসম্ভব নয় যে, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮-৭৯

ঘ. যিক্‌রে ইলাহী

কুরআনের সাথে নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই একথা বলবো, নামাযই ছিলো নবী পাকের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। এরি মাধ্যমে সাহায্য লাভ করতেন। কোনো কিছু যখন তাঁকে চিন্তায় নিক্ষেপ করতো, তিনি নামায পড়তে আরম্ভ করতেন।

তিলাওয়াতে কুরআন এবং সালাত আদায় ছাড়াও তিনি অধিক অধিক আল্লাহর যিক্‌র করতেন। তাঁর একত্বের স্বীকৃতি প্রকাশ করতেন। তাকবীর ও তাসবীহ্ করতেন। তার হামদ করতেন এবং শোকর গুজারী করতেন। রাত দিন, সকাল সন্ধ্যা এবং প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি কার্যোপলক্ষ্যে ছোট ছোট বাক্যে তিনি এ অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতেন। এসব যিকিরের জন্যে আবার সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। সময় নির্ধারণ করেছেন। নিজে এ নিয়মের অনুসরণ করতেন। সাথীদের এরূপ করতে তাকীদ করতেন। এমনিভাবে জামায়াতী জিন্দেগীতে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের প্রকাশকে জীবন প্রবাহের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। একইভাবে তিনি সর্বাবস্থায় প্রতিটি সুযোগ ও প্রয়োজনে ব্যাপক ভাবের অধিকারী মর্মস্পর্শী আবেগময় দোয়াসমূহ নির্ধারণ করে সেগুলোর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বিশেষভাবে তিনি নিয়মিত ইস্তেগফার করতেন। আল্লাহর ইবাদাত এবং তার নিকট দোয়া করার সাথে সাথে ইস্তেগফারকেও তিনি দাওয়াতের বুনিয়াদী অংশে পরিণত করে নিয়েছিলেন। তিনি নিজে অধিক অধিক ইস্তেগফার করতেন। এমনভাবে করতেন যে, তাঁর সাথীরা জানতো, তিনি ইস্তেগফার করছেন। প্রতিটি কাজের পরিসমাপ্তিতে প্রতিটি সভা বৈঠকের প্রাক্কালে তিনি

ইস্তেগফার করতেন। তাঁর কোনো কোনো সাথী তাঁকে দৈনিক সত্তর বারেরও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেখেছেন। তাঁর সাথীরাও তাঁর অনুবর্তন করে চলতেন।

ঙ. সবর

আপন রবের সাথে ইবাদাত, ইখলাস, মহব্বত, শোকর এবং তাওয়াক্কুলের মতো গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গ মডেল ছিলেন নবী করীম (স)। রবের আনুগত্যের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদায়। তাঁর পথে নিজের সবকিছু কুরবানী করতেন, সবকিছু বিলিয়ে দিতে তিনি ছিলেন সকলের আগে। এ সবগুলো দিকের বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অবশ্য তার নিকট সবরের আকারের নৈতিক চরিত্রের যে বিরাট ভাণ্ডার ছিলো, তাঁর দুয়েকটি দিক সম্পর্কের আলোচনা জরুরী মনে করছি। অবশ্য তাঁর পূর্ণাঙ্গ চরিত্র তো এমন এক অথৈই সমুদ্র, ডুব দিয়ে যার অসীম গহীনতায় পৌছা অসম্ভব। কেবলমাত্র সবরেরই এতো ব্যাপক বিস্তৃত দিক রয়েছে, যার সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন।

❐

৪. বিরুদ্ধবাদীদের সাথে রাসূলে খোদার আচরণ

ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনকে সম্মুখে অগ্রসর করার পথে ছিলো সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি ও বিপদ মুসীবত। এর কোনো কোনোটি ছিলো বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে। কোনোটি ছিলো তাদের বিরোধিতার ফলে নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট অবস্থা ও অনুভূতির ফলশ্রুতি। কোনোটি ছিলো নিজ সাথীদেরকে শীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় মযবুত করে গড়ে তুলে আপোসহীনভাবে সম্মুখে অগ্রসর হবার কারণে। এসব কিছুর মোকাবিলায় তিনি সবর অবলম্বন করেন। সবরের সাথে কার্যসম্পাদন করেন। একথাগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক। কিন্তু এর কিছু কিছু বিবরণ অবগত হওয়া জরুরী। মন্দের মোকাবিলায় ভালো এবং দয়া ও ক্ষমার মতো মহৎ গুণাবলী দ্বারা তিনি তাঁর মিশন চালিয়ে যান। এসব মহৎ গুণাবলীরও ভিত্তি হচ্ছে সবর। কিন্তু এখন আমাদের দেখতে হবে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা এবং তার অবস্থার সেই দিকগুলো কি ছিলো যেগুলো মুকাবিলায় তাঁর সবরের ধরন জানাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ক. মৌখিক বিরোধিতা

দৈহিক অত্যাচার-নির্যাতন বরদাশত করা, তার মুকাবিলায় স্বস্থানে অটল অবিচল হয়ে থাকা এবং অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখা সবরের অনিবার্য দাবী। কিন্তু এক দীর্ঘ অবিরাম প্রাণান্তকর সংগ্রামে সর্বাধিক কষ্টকর, সর্বাধিক বিপজ্জনক এবং সবচেয়ে ভয়াবহ পরীক্ষা ও মুসীবত হয়ে থাকে সেটা, যা নাকি মৌখিকভাবে এসে থাকে। কুরআন মজীদ এর ব্যাখ্যা করেছে يَقُوْلُوْنَ (তারা যা বলে) শব্দ দ্বারা। কেননা দৈহিক মুসীবত কঠিন হলে তা জানা যায় এবং অনুভব করা যায়। আর দৈহিক মুসীবত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ, মানবিক দেহের সহ্যশক্তি তো সীমিত। দৈহিক নির্যাতনের ফলে হয়তো মানুষ দুর্বলতার শিকার হয়ে তার অবস্থান থেকে কিছুটা সরে যেতে পারে। কিন্তু এতে ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হওয়া নিজেকে সঠিক মনে করা সত্ত্বেও ভ্রান্তপথ অবলম্বন করা, সন্দেহ সংশয়ে নিমজ্জিত হওয়া, আগ্রহ উদ্যমে ভাটাপড়া, নিরাশা ও দুশ্চিন্তার শিকার হওয়া, আন্দোলনের সাথে নিঃসম্পর্ক ও নিস্তেজ হয়ে পড়া তার জন্য সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে, মৌখিক বিরোধিতা অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়, শিরা উপশিরাকে টুকরা টুকরা করে দেয়, অন্তরকে ভেঙে চুরমার করে দেয়, আর মন মানসিকতাকে নিমজ্জিত করে দেয় দ্বিধাসংশয়ে। এ অবস্থা চলতে থাকে অবিরাম। কারণ, কারো গায়ে হাত উঠানোর চেয়ে বাক্যবানে জর্জরিত করে দেয়াতো অধিকতর সহজ কাজ। ভদ্রতার (?) কাজ। রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধবাদীরা একাজটিই করছিলো-হরদম। তাই শুরুতেই কুরআন মজীদ তাঁকে মৌখিক বিরোধিতার মোকাবিলায় 'সবর' অবলম্বনের তালীম দিয়েছে। এর তাকীদ পরবর্তীতেও অব্যাহত রেখেছে।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاًO- المزمل : ١٠

"আর লোকেরা যেসব কথাবার্তা রচনা করে বেড়াচ্ছে, সে জন্য তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সৌজন্য রক্ষা করে তাদের থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যাও।"–সূরা আল মুয্যাম্মিল ঃ ১০

বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর সেই সব কথার সত্যতাকে অস্বীকার করছিলো। যা তাঁর নিকট ছিলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তারা রসিকতা করছিলো। ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলো। চোগলখুরি করে বেড়াচ্ছিল। অপবাদ দিচ্ছিল। বাক্যবান ছাড়াও ইশারা ইংগিতে বদনাম করছিলো। প্রোপাগাণ্ডার ঝড় তুফান বইয়ে দিচ্ছিল। তাঁর নিয়ত ও নিষ্ঠার উপর সন্দেহ করছিলো। তাঁর কথাগুলো বিকৃত করছিলো। বিকৃত করছিলো সেগুলোর অর্থ। জিদ ও হঠকারিতার সীমা তারা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। তারা মিথ্যা অপবাদের প্লাবন সৃষ্টি করে মানুষকে সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত করে দিচ্ছিল। কিন্তু ....

কিন্তু এগুলোর কোনোটিই রাসূল (স)-কে তাঁর অবস্থান (Stand) থেকে টলাতে পারেনি। রুখতে পারেনি তাঁর অগ্রাভিযান। তিনি তাঁর মন মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। কথাবার্তাকে আয়ত্তে রেখেছেন। মন্দের জবাব মন্দ দ্বারা দেয়া থেকে জবানকে রক্ষা করেছেন। স্বীয় গন্তব্যপথে অটল অবিচল হয়ে থেকেছেন।

স্বীয় ঈমান ও একীনের উপর অটল থাকা এবং নিজ দায়িত্ব পালনের কাজে লেগে থাকা ছাড়াও তিনি পুঁতির মালার মতো ক্রমাগত পরীক্ষা-সমূহের মুকাবিলায় পূর্ণ সবরের নীতি অবলম্বন করেন। এ সবরের ধরন ছিলো বিচিত্র।

এক প্রকার সবর ছিলো এই যে, তিনি বিরুদ্ধবাদীদের এসব কথার জবাব দিতেন না। তাদের সাথে তর্ক ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হতেন না।

ফিরে আসতেন। কারণ তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হলেও তারা সত্য কবুল করতো না। কেবল তাঁরই সময় নষ্ট হতো। তাছাড়া এসব ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাটা তো ছিলো তাঁর দীন এবং তাঁর নিজের জন্য ক্ষতিকর।

দ্বিতীয়ত, এ লোকদের সাথে বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসারতো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তিনি যখন তাদের থেকে পৃথক হতেন, তখন শত্রুতা, হিংসা এবং ঝগড়া বিবাদ করে পৃথক হতেন না। মানবিক সহমর্মিতার আচরণ অব্যাহত রাখতেন। দাওয়াতের কাজও জারি রাখতেন। এ জিনিসটাকেই কুরআন মজীদ هَجْرًا جَمِيْلاً (সৌজন্য রক্ষা করে সম্পর্কহীন হওয়া) দ্বারা বিশ্লেষিত করেছে। قَـالُوْا سَلٰمًـا আয়াতাংশেও এ চিত্রই অংকিত হয়েছে اَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِيْنَ (জাহেলদের থেকে দূরে থাকো) আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে। অনুরূপ নির্দেশই দেয়া হয়েছে لاَتَقْعُدُوْا (তাদের সাথে বসো না) দ্বারা। বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ـ الفرقان : ٦٣

"আর জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে এলে বলে দেয় ঃ তোমাদের সালাম।"–সূরা আল্ ফুরকান ঃ ৬৩

وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ـ الاعراف : ١٩٩

"এবং জাহেল লোকদের থেকে বিরত থাক।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৯৯

اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ـ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ط ـ النساء : ١٤٠

"তোমরা যেখানেই আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরীর কথা বলতে এবং এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুনবে, সেখানে তোমরা আদৌ বসবে না, যতোক্ষণ না তারা অন্য কোনো কথায় লিপ্ত হয়। তোমরা যদি তা করো, তবে তোমরাও তাদেরই মতো হবে।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১৪০

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ ـ الانعام: ١٤٠

"তুমি যখন দেখবে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহের দোষ সন্ধান করছে, তখন তাদের নিকট থেকে সরে যাও।"–সূরা আনআম ঃ ৬৮

তাঁর এর চেয়েও মহান মর্যাদা এ ছিলো যে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। গালির জবাবে গালি না দিয়ে দোয়া করেছেন। মন্দের জবাব দিয়েছেন ভালো দিয়ে। এ বিষয়ে আমরা সম্মুখে আলোচনা করবো।

যখন লোকেরা কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে অস্বীকার করতে থাকে, সত্যের আহ্বান শুনেও শুনে না, অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় মেতে ওঠে, সত্যের আহ্বানকারীকে তুচ্ছ ও নগণ্য জ্ঞান করে। মানব স্বভাবের এ এক অনিবার্যতা যে, তখন দুঃখ বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। নবী করীম (স)-এরও এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু কুরআনের সাহায্যে তিনি তা উৎরে উঠতেন। এ অবস্থার উপর বিজয়ী হতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সান্ত্বনা পাওয়ার পর তিনি পূর্ণ উদ্যোমে স্বীয় দায়িত্ব পালনে লেগে যেতেন।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○- يس : ٧٦

"কাজেই এ লোকেরা যেসব কথা বলে তা যেনো তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখিত না করে। তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কথাই আমরা জানি।"-সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৬

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ط اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا- لقمان : ٢٣

"অতপর যে কুফরী করে, তার কুফরী যেনো তোমাকে চিন্তান্বিত না করে। তাদেরকে তো আমার নিকট ফিরে আসতেই হবে। তখন আমি তাদেরকে বলে দেব তারা কি সব করে এসেছে।"-সূরা লুকমান ঃ ২৩

এমনি করে বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্র ও হঠকারিতা, ইসলামী দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য তাদের তৎপরতা, দাওয়াতপ্রাপ্ত কিছু লোকদের কুফরের সাথে মেলামেশা এবং কাফেরদের সাথে যোগসাজশ তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতো। তাঁর মনকে ছোট করে দিতো। এ অবস্থার মুকাবিলাও তিনি কুরআনের সাহায্যেই করতেন।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُوْنَ - النحل : ١٢٧

"এ লোকদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত হয়ো না আর তাদের অবলম্বিত ষড়যন্ত্রের দরুন দিল ভারাক্রান্ত করো না।"-নাহল ঃ ১২৭

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا

بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ج وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ج - المائدة : ٤١

"হে নবী সেইসব লোক যারা খুব দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে অগ্রসর হচ্ছে, যেনো তোমার কোনো দুশ্চিন্তার কারণ না হয়। যদিও তারা সেই সব লোক যারা মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আসলে তাদের দিল ঈমান আনেনি। কিংবা এরা সেইসব লোক হলেও যারা ইহুদী হয়ে গেছে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪১

ত্বরিত পাওয়ার ইচ্ছা ও ত্বরিত ফল লাভের বাসনা মানব মনের এক শাশ্বত বৈশিষ্ট্য। এর মুকাবিলা করার জন্যও প্রয়োজন বিরাট সবরের। বরঞ্চ কেউ কেউ তো বলেন, তাড়াহুড়া না করার অপর নামই সবর। নবী পাকের এ সবরের ধরন ছিলো বিভিন্নমুখী। একটা দিক এ ছিলো, যখন তাঁর চরম প্রচেষ্টা ও পরম আন্তরিকতা সত্ত্বেও লোকেরা তাঁর দাওয়াত কবুল করতো না, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন চাইতো এ লোকেরা যা কিছু দাবী করছে কিংবা যা কিছু শর্তারোপ করছে, তন্মধ্যে কোনো দাবী বা শর্ত পূর্ণ হয়ে যাক, যাতে করে তারা বাস্তব প্রমাণ ও নিদর্শন পেয়ে যায় এবং দাওয়াত কবুল করে নেয়। আরেকটা দিক ছিলো এই যে, তাদেরকে ধ্বংসের যে ওয়াদা করা হয়েছে, তার কিছু অংশ তাদের প্রত্যক্ষ করানো হোক। এমন একটা খেয়ালও তাঁর মনে জাগতো যে, এই হক ও সত্য পথের কাফেলা অতি দ্রুত মনযিলে মাকসাদে পৌঁছে যাক।

এ সকল অবস্থায় তিনি কুরআনী হেদায়াতের ভিত্তিতে ধৈর্য ও সবরের নীতি অবলম্বন করতেন। যুক্তিহীন দাবী পূর্ণ করা কিংবা আল্লাহর আযাব সংঘটিত হওয়া না হাওয়া বা মনযিলে মাকসাদে পৌছার যাবতীয় বিষয় সরাসরি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি স্বীয় কর্মব্যস্ততায় লেগে যেতেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন প্রাণান্তকর সংগ্রাম ও পরীক্ষার পথ পরিহার করে কামিয়াবীর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই ঃ

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَايُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ج وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ج وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِئ الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○ ـ الانعام : ٣٣-٣٥

"(হে নবী!) আমি জানি, এরা যেসব কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে তাতে তোমার বড়ই মনোকষ্ট হয়। কিন্তু এরা কেবল তোমাকেই অমান্য করছে না। এ যালেমরা মূলত আল্লাহর বাণী ও নিদর্শনসমূহকেই অস্বীকার করছে। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অমান্য করা হয়েছে। কিন্তু এ অস্বীকার এবং তাদের প্রতি আরোপিত জ্বালাতন নির্যাতন তারা বরদাশত করে নিয়েছিলো। অবশেষে তাদের নিকট আমার সাহায্য পৌঁছে। আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। পূর্ববর্তী নবীদের খবরাদি তো তোমার নিকট এসে পৌঁছেছে। তা সত্ত্বেও তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা সহ্য করা যদি তোমার পক্ষে কঠিন হয় তাহলে তোমার শক্তি থাকলে যমীনে কোনো সুড়ঙ্গ তালাশ করো অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে নাও এবং তাদের সম্মুখে কোনো নিদর্শন পেশ করতে চেষ্টা করো। আল্লাহ যদি চাইতেন তবে এসব লোককে তিনি হেদায়াতের উপর একত্র করতে পারতেন। অতএব তুমি অজ্ঞ-মূর্খের মতো হয়ো না।"–সূরা আল আনআম ঃ ৩৩-৩৫

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ - الاحقاف : ٣٥

"অতএব (হে নবী!) সবর অবলম্বন করো, যেভাবে উচ্চসংকল্পসম্পন্ন রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন। আর এ লোকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না।"–সূরা আল আহকাফ ঃ ৩৫

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ - المؤمن : ٥٥

"অতএব (হে নবী!) ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহর ওয়াদা সত্য সঠিক। আর নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও।"–সূরা মু'মিন ঃ ৫৫

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ ج - يونس : ١٠٩

"(হে নবী!) তুমি সেই পথনির্দেশের অনুসরণ করো, যা অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছে। আর আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো।"–সূরা ইউনুস ঃ ১০৯

ঋ. মোকাবিলা এবং জিহাদ

যে লোকগুলো বিরোধিতা করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে, কথায় ও কাজে চরম শত্রুতা করেছে, এমনকি একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তারা আর সত্যকে মেনে নেবে না। তারা উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। রাসূল (স)-এর দাওয়াত ও আন্দোলনকে নির্মূল করার চেষ্টা

করেছে। ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। আর যেসব লোক ঈমান আনার দাবী করা সত্ত্বেও কাফিরদের সহযোগিতা করেছে এবং আন্দোলনের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টা করেছে। এ সকলের সাথে নবী পাক (স) কঠোরতা অবলম্বন করেন। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। এরূপ না করাটা ছিলো সেই মহান উদ্দেশ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর, যা তাঁর উপর ন্যস্ত ছিলো। অবশ্য একাজে তিনি বিন্দুমাত্র বাড়াবাড়ি করেননি। সীমাতিক্রম করেননি। তলোয়ার উত্তোলন করেছেন বটে, কিন্তু ইনসাফ ও নৈতিকতার সকল সীমা হেফাজত করেছেন ঃ

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ـ الفرقان : ٥٢

"(হে নবী!) কখনো কাফিরদের আনুগত্য করো না। আর এ কুরআনকে সাথে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মহা জিহাদে অবতীর্ণ হও।"

–সূরা আল ফুরকান ঃ ৫২

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط ـ

التوبة : ٧٣، التحريم : ٩

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করো।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৭৩ ; সূরা আত তাহরীম ঃ ৯

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِيْنَ ـ البقرة : ١٩٠

"আর তোমরা আল্লাহর পথে সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯০

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز ـ

"কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা যেনো তোমাদের এতোদূর উত্তেজিত না করে দেয় যে, তার ফলে তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করে বসবে। ইনসাফ করো। বস্তুত খোদাপরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮

যেসব বিরুদ্ধবাদীর বিরোধিতা শত্রুতা, লড়াই এবং ষড়যন্ত্র পর্যন্ত পৌঁছায়নি, কিংবা যারা হেদায়াতের পথে ফিরে আসবে না একথা সুপ্রমাণিত হয়নি, নবী করীম (স) তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত নীতি অবলম্বন করেননি।

গ. উত্তম নৈতিকতা

কিন্তু উক্ত দুই ধরনের লোকদের সাথে আচরণের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা যেটা, তা হচ্ছে তিনি কখনো তাদের গালি দেননি। বিদ্রূপ করেননি। ঠাট্টা করেননি। অপমানিত করেননি। নিকৃষ্ট ধরনের আচরণ করেননি। কাউকেও পরিহাস করেননি। হিংসা বিদ্বেষের বশবর্তী হননি। এমনকি কখনো কোনো অভদ্র শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করেননি। তাদের মূর্তি ও মিথ্যা খোদাদের পর্যন্ত গালাগাল করেননি। অথচ এদের পূর্ণ সমালোচনা করেছেন। আর আলেম ও ইহুদীদের প্রতি সমালোচনার যে ভাষা কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে, তা ঐ সমালোচনার ভাষার তুলনায় অনেক কোমল, যা বাইবেলে ইসরাঈলী পয়গম্বর হযরত ইয়াসা'আ, হযরত ইয়ারমিয়াহ এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ব্যবহার করেছেন। এমন করে তিনি কখনো কোনো প্রশ্নকারীর প্রতি রুষ্ট হননি। ধমক দেননি কখনো। কারো সাথে হীন আচরণ করেননি। অগ্নিশর্মা হননি কারো প্রতি। গাল ফুলাননি কখনো। করেননি কখনো ভ্রূকুঞ্চিত। এ ব্যাপারেও তাঁর আচরণ ছিলো কুরআনেরই পূর্ণাঙ্গ নমুনা ঃ

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ

عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط ـ

"(হে ঈমানদার লোকেরা!) না পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষ ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না নারীরা অন্যান্য নারীদের ঠাট্টা করবে। হতে পারে ওরা তাদের থেকে উত্তম হবে। নিজেদের মধ্যে একজন আরেকজনকে দোষারোপ করো না, আর না একজন অপর লোকদের খারাপ উপমাসহ স্মরণ করবে।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১১

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ـ لقمن : ١٨

"আর লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না। যমীনের উপর অহংকারের সাথে চলাফেরা করো না। আল্লাহ কোনো আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পসন্দ করেন না।"–সূরা লুকমান ঃ ১৮

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ○ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ○ ـ الضحى : ١٠-١١

"আর প্রার্থীকে ধিক্কার তিরস্কার করবে না এবং তোমার রবের নিয়ামতকে প্রকাশ করতে থাকো।"–সূরা আদ দোহা ঃ ১০-১১

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ الانعام : ١٠٨

"(হে ঈমানদার লোকেরা!) এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাতই করে, তাদের তোমরা গালাগালি দিও না।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১০৮

ঘ. মন্দের জবাব ভালো দিয়ে

প্রকৃতপক্ষে, বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নবী করীম (স) এর চেয়েও উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন, রাহমাতুল্লিল আলামীন। ছিলেন অনুগ্রহ ও কোমলতার মূর্তপ্রতীক। তাঁর সাথে যে বাড়াবাড়ি করতো, তাকে তিনি ক্ষমা করে দিতেন। যারা তাঁর রক্ত ঝরিয়েছে তাদের জন্য তিনি দোয়া করতেন। যে তাঁর সাথে নিকৃষ্ট আচরণ করতো, তিনি তার সাথে উৎকৃষ্ট আচরণ করতেন। এদিক থেকেও তাঁর সীরাতে পাক ছিলো কুরআনেরই নমুনা ঃ

خُذِ الْعَفْوَ ـ الاعراف : ١٩٩

"(হে নবী!) নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করো।"

–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৯৯

وَجَزٰؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط ـ

"আর মন্দের বদলা ঐ রকম মন্দ। যে কেউ ক্ষমা করে দেবে ও সংশোধন করে নেবে, তার পুরস্কার আল্লাহর যিম্মায়।"

–সূরা আশ শূরা ঃ ৪০

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ○ ـ حم السجدة : ٣٤

"আর (হে নবী!) ভালো ও মন্দ সমান নয়। তুমি অন্যায় ও মন্দকে দূর করো সেই ভালো দ্বারা যা অতি উত্তম। তুমি দেখতে পাবে তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিলো, সে প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।"
–সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৩৪

তায়িফের ঘটনা

এ সুযোগে সীরাতে পাকের একটি ঘটনা সম্মুখে আনা উচিত। তা হচ্ছে, তাঁর তায়িফ সফরের ঘটনা। মক্কায় যখন অধিকাংশ লোক তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো এবং এ শহরকে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি বানানোর কোনো সম্ভাবনা থাকলো না, তখন তিনি তায়িফ গমন করেন। আশা করছিলেন, তায়িফবাসী সে কেন্দ্র উপহার দেবে। আশা করছিলেন এখানে তাঁর ও তাঁর আন্দোলনের জন্য ভূ-খণ্ড পাওয়া যাবে। একটি উম্মাত এখান থেকে উত্থিত হবে। কায়েম হবে আল্লাহর দীন।

তায়িফের তিনজন সরদারই অতি নিকৃষ্ট পন্থায় তাঁর সম্বর্ধনা করেছে। একজন বলেছে, আল্লাহ তোমাকে ছাড়া আর কাউকেও পাননি তাঁর রাসূল বানানোর জন্য ? দ্বিতীয় জন বলেছে, তোমার মতো ব্যক্তিকে রাসূল বানানো দ্বারা কা'বার পর্দা ফেটে যায়নি। তৃতীয় জন বলেছে, যদি তুমি সত্য নবী হও তবে তোমার সাথে কথা বলার উপযুক্ত আমি নই, আর তুমি যদি মিথ্যা হও তবে আমাদের সাথে কথা বলার উপযুক্ত তুমি নও। তিরস্কার করে তাড়িয়ে দেবার পর তিনজন সরদারই তাঁর বিরুদ্ধে উচ্ছৃংখল বালকদের লেলিয়ে দেয়। তারা তাঁকে গালাগালি করে এবং পাথর মারতে শুরু করে। তাঁর দেহ থেক রক্ত ঝরে জুতায় জমে যায়। অবশেষে তিনি এক বাগানে আশ্রয় নেন। এসময় তাঁর নিকট জিবরাঈল আমীন আগমন করেন। সাথে এসেছেন পাহাড়ের ফেরেশতারা। জিবরাঈল বললেন, পাহাড়ের ফেরেশতারা আমার সাথে এসেছেন, আপনার নির্দেশ পেলেই তায়িফবাসীদের দুই পাহাড়ের মাঝখানে পিষে ফেলতে পারি। আল্লাহর পথে আহ্বানকারী আল্লাহর রাসূল বললেন, না আমি এ ব্যাপারে নিরাশ নই যে, এ জাতির মধ্যে আল্লাহর বন্দেগী করার লোক পয়দা হবে।

বস্তুত এই ছিলো তাঁর মহান নৈতিক চরিত্র। এরি ফলে মানুষ পতংগের মতো তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর চারপাশে একত্র হয়েছে। তাঁর এ চরিত্রই বিরুদ্ধবাদীদের অন্তর জয় করেছে। উহুদ যুদ্ধে যারা তাঁর রক্ত ঝরিয়েছে, মক্কায় দীর্ঘদিন যারা তাকে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছে, যারা তাঁর

প্রিয়তম স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে, এ সকলের প্রতি তাঁর ক্ষমা ও করুণাই বিজয়ী হয়েছে।

যারা তাঁর আহ্বানে লাব্বায়িক বলেছে, এদের মধ্যে এক দল লোকতো ছিলো তারা, যারা তাঁর আহ্বান শুনেছে—কুরআনের বাণী তাদের কানে পৌঁছেছে। আমার সীমিত জ্ঞানে এদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। আরেক দল ছিলেন তারা, যারা স্বচক্ষে তাঁকে দেখেছেন, তাঁর চরিত্র দেখেছেন, সীরাত দেখেছেন, চেহারা মুবারক দেখেছেন। দেখে বলেছেন, এ চেহারা মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। তাঁর উদারতা ও মহানুভবতা দেখে তারা আকৃষ্ট হয়েছেন এবং ঈমান এনেছেন। এদেরই সংখ্যা ছিলো অধিক। ইসলামী আন্দোলন আশিখরনখ আত্মোৎসর্গকারী যে একদল লোক পেয়েছে, মূলত এদেরকে তার আহ্বানকারীর মহান ব্যক্তিত্বের চুম্বকই একত্র করেছে।

❐

৫. আন্দোলনের সাথীদের সাথে রাসূল (স)-এর আচরণ

কোনো আকীদাহ বিশ্বাস ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের উপর মানুষকে একত্র করে নেয়াটা সহজসাধ্য কাজ নয়। কিন্তু তার চেয়েও কষ্টসাধ্য কাজ হচ্ছে এর উপর তাদেরকে একত্র রাখাটা। অর্থাৎ তাদের একজনের সাথে আরেকজনকে মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা। মালার মতো এক সূতায় গেঁথে এককে পরিণত করা। মেজাজে সমতা সৃষ্টি করা। আবেগ ও আকর্ষণকে জীবিত এবং স্থায়ী রাখা। আন্দোলনের চড়াই উতরাইয়ে উদ্দেশ্যের উপর অটল রাখা এবং মনযিলে মাকসাদের দিকে তাদের এগিয়ে নেয়া।

ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতা প্রতিটি সংগঠিত এককের মধ্যে সহজেই প্রবেশ তাকে দুর্বল করে দেয়। এমতাবস্থায় একজন যোগ্য ও বিজ্ঞ নেতার কাজ হচ্ছে দাওয়াতে যারা লাব্বায়িক বলেছে তিনি তাদেরকে আন্দোলনে মজবুতভাবে একত্র করে রাখবেন।

দাওয়াত আন্দোলনের অন্তর্গত সম্মোহন এবং আন্দোলনের নেতার চারিত্রিক গুণাবলী ছাড়াও পরিবেশের চাপ, বক্তৃতা, লিখিত প্রচার এবং শ্লোগান ইত্যাদি মানুষকে একত্র করা ও ভীড় জমানোর ব্যাপারে সফল হয়। কিন্তু এ জনতাকে এমন একটি সাংগঠনিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা এবং সেই শক্তিকে এমনভাবে কাজে লাগানো যে, তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে নেতার সাথী হয়ে থাকবে, এটা খুবই কঠিন কাজ।

বস্তুত একাজের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নেতার প্রয়োজন। আর নবী করীম (স)-এর সীরাত এরূপ নেতৃত্বের আদর্শ নমুনা।

দুনিয়ার অন্যান্য নেতারাও মানুষকে একত্র করে তাদের থেকে কাজ আদায় করেছেন। হক এবং বাতিল উভয় পথের নেতারাই একাজ করেছে। কিন্তু সাধারণভাবে তাদের সহকর্মীরা আন্দোলনের কোনো না কোনো অধ্যায়ে পৌঁছে কিছু না কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। কেবল মাত্র নবী করীম (স)-এর সাথী এবং অনুসারীরাই তাঁর যুগে এবং আজ চৌদ্দশত বছর পর পর্যন্ত তাঁর প্রতি এতোটা অনাবিল আসক্ত অনুরক্ত যেমনটি আসক্ত অনুরক্ত ছিলো প্রথম দিন।

রাউফুর রাহীম

এ বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি করেছে কোন্ জিনিস? এ-ও ছিলো তাঁর চরিত্রেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর এ বিস্ময়কর চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি দিক আমরা এখানে আলোচনা করবো। তবে আমার বিশ্বাস তার চরিত্রের এ বিস্ময়কর গুণাবলীকে দুটি শব্দের মধ্যে একত্র করা যায়। কুরআনই তাঁর জন্য শব্দ দুটি ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ তাঁর সাথীদের প্রতি, মু'মিনদের জামায়াতের প্রতি তিনি ছিলেন "রাউফুর রাহীম"—সহমর্মী-করুণাসিক্ত।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○ - التوبة : ١٢٨

"লক্ষ করো, তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন। তিনি তোমাদের মধ্যেরই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক। তোমাদের সার্বিক কল্যাণেরই তিনি কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত।"
–সূরা আত তাওবা ঃ ১২৮

শব্দ দুটি সিদ্ধান্ত হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে এ যেনো আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের আচরণ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনার জন্যে সেই শব্দদ্বয়কে ব্যবহার করলেন যা তিনি ব্যবহার করেছেন নিজের জন্য। ..... প্রকাশ থাকে যে, সমগ্র সৃষ্টি ও মানবজাতির জন্য নবী পাকের অস্তিত্ব, তাঁর রিসালাত ও হেদায়াতের ইতিহাস সতর্কীকরণ ও সুসংবাদ দান, ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং চারিত্রিক মহত্ত্বকে কুরআন মজীদ একটি মাত্র শব্দে প্রকাশ করেছে। আর তা হচ্ছে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' (رَحْمَتً لِّلْعَالَمِيْنَ)। আপন সাথীদের সাথে নবী পাক (স)-এর সম্পর্ক ও আচরণের যে দিক ইচ্ছে দেখে নিন। যে কোণ থেকে ইচ্ছে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। যে রং ইচ্ছে উন্মুক্ত করুন। দেখবেন ছবি একটিই তৈরী হচ্ছে। আপদমস্তক মহব্বত, দয়া ও করুণার প্রতিচ্ছবি।

উক্ত শব্দ দুটির প্রতি আরো প্রশস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখুন। সব ধরনের উত্তম গুণ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যই এগুলোর ভাবধারার মধ্যে নিহিত রয়েছে। সহকর্মীদের প্রতি মহব্বত, ভালোবাসা, তাদের মূল্যদান, কল্যাণ কামনা, সেবা, পরিশুদ্ধ করা, শিক্ষাদান করা, তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ, তাদের প্রতি দয়া ও ক্ষমাশীল হওয়া, এমনকি তাদের আদব শিক্ষাদান

এবং শাস্তিদানও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যদি তাঁর 'ইসমে জাত' হিসেবে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, তবে তা হচ্ছে 'রাহমান'। এ 'রাহমান' এমন একটি সিফাত, যা প্রায় তাঁর সমস্ত সিফাতকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর রাহমানের রাসূল রাউফুর রাহীম হবেন না তো কী হবেন ?

কুরআন মজীদের যে আয়াতটিতে নবী করীম (স)-এর জন্য এ মৌলিক শব্দ দুটির উল্লেখ হয়েছে, সে আয়াতেই শব্দ দুটির বিশ্লেষণও রয়েছে। 'রাউফুন' (সহানুভূতি সম্পন্ন) এর মধ্যে নেতিবাচক দিক প্রভাবশীল রয়েছে। তাহচ্ছে ক্ষতি ও অনিষ্ট বিদূরিত হওয়া। অর্থাৎ এমন দয়া ও সহানুভূতি যা এমন কোনো জিনিস বরদাশত করে না এবং এমন প্রতিটি জিনিস দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করে, যা ক্ষতি, কষ্ট ও অনিষ্টের কারণ হতে পারে। আর 'রহমতের' মধ্যে ইতিবাচক অর্থাৎ কল্যাণ দানের দিক প্রভাবশীল রয়েছে। অর্থাৎ এমন সহানুভূতি ও কল্যাণ যা উপকার, উন্নতি এবং কামিয়াবী ও কল্যাণের দ্বারসমূহ খুলে দেয়।

কুরআন থেকে একথা স্পষ্ট এবং তাঁর গোটা পবিত্র জীবনেও তা উজ্জ্বল হয়ে আছে যে, প্রথম থেকেই তাঁর দয়া ও সহানুভূতি এতোটা ব্যাপক ছিলো যে, তাঁর সাথীদের জন্য কোনো না কোনো প্রকারে ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন প্রতিটি জিনিস তাঁকে দারুণ পীড়া দিতো। এ অবস্থায় তাঁর অন্তর ও আচরণের মধ্যে যে অবস্থা সৃষ্টি হতো তার আধিক্য বুঝানোর জন্য কুরআন পাকে عَزِيْزٌ (আযীয) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ সর্বব্যাপী প্রভাবশালী। এতে কেবল একথাই শামিল নেই যে, তাঁর কোনো কথা ও কাজ দ্বারা কখনো কেউ কোনো প্রকার কষ্ট পায়নি। তিনি কাউকেও গালমন্দ করেননি। কাউকেও অপমানিত করেননি। কাউকে অপবাদ দেননি। কারো গীবত করেননি। কারো সম্মানহানি করেননি। কারো গায়ে হাত উঠাননি ; বরঞ্চ তাতে একথাও শামিল রয়েছে যে, দীনের দাবী, আন্দোলনের দায়িত্ব এবং শরীআতের বিধানেও তিনি এমন কিছু দাবী করেননি যা কষ্টসাধ্য। প্রকাশ থাকে যে, এতে সেসব ত্যাগ ও কুরবানীর দাওয়াত অন্তর্ভুক্ত নয়, যা দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবীর দ্বার উন্মোচনকারী।

অপরদিক থেকে তাঁর অবস্থার ধরন এমন ছিলো যে, তার ব্যাখ্যা কেবল حَرِصٌ (লোভ বা আন্তরিক কামনা) শব্দ দ্বারাই করা যেতে পারে। এ শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, শুধু ভালো, কল্যাণ ও উন্নতির জন্য

প্রতিটি কথা বলা, এজন্যই প্রতিটি কাজ করা। আর এমনটি যতোই বলা হয়, যতোই করা হয়, মন তৃপ্ত হয় না। না জানি কোনো কিছু বাদ পড়ে যায়। মন চায় অধিক অধিক এমনটি করতে! প্রতিটি মুহূর্ত তা অব্যাহত রাখতে। এ ধ্যান এ চিন্তাই তাঁকে সর্বক্ষণ পেরেশান করে রাখতো! এ-ই ছিলো তাঁর আকাঙ্ক্ষার ধরন। এ-ই ছিলো তাঁর অবস্থা!

তাঁর দিলটাও ছিলো এই মহান দুটি গুণেরই ছাঁচে ঢালা এবং আমলও। তা বিদীর্ণ হয়ে যতো আকৃতিতেই প্রকাশ হয়েছে, যতো পুষ্প পল্লব আর যতো ফলই তা থেকে বের হয়েছে, তা গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আকৃতি থেকে যে আলো বিকীর্ণ হচ্ছে, তা দ্বারা অন্তর ও চলার পথ আলোকিত করে নেয়া উচিত। তাঁর প্রত্যেক সাথীই মূল্যবান ছিলেন। আর তিনিও পৃথিবীর সমস্ত বিলাসী সৌন্দর্য থেকে দৃষ্টি গুটিয়ে এনে তা কেবল নিজ সাথীদের প্রতিই নিবদ্ধ করেছিলেন। প্রতিটি মুহূর্ত তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও পরিশুদ্ধির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। দয়া, কোমলতা ও স্নেহ মহব্বতের ব্যবহার তাদের সাথে করতেন। প্রত্যেকের সাথে আচরণ করতেন, তার যোগ্যতা ও মানসিক শক্তি-সামর্থের ভিত্তিতে। তাদের পরামর্শে শরীক করতেন। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন তাদের ভুলভ্রান্তি। দয়া ও ক্ষমার প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি।

ক. মর্যাদার অনুভূতি ও নিবীড় সম্পর্ক

যে ব্যক্তিই আল্লাহর গোলামীর পথে তাঁর সাথী হয়েছে, তাঁর হাতে হাত দিয়ে বায়াত করেছে, সকলকে ত্যাগ করে তাঁর পিছে চলেছে, তাঁর ঈমান ও জিহাদের দাওয়াতে লাব্বায়িক বলে সাড়া দিয়েছে, সে ছিলো তাঁর নিকট সর্বাধিক মূল্যবান পুঁজি। তার আসন ছিলো তাঁর অন্তরে। তার সাথে ছিলো মহব্বতের সম্পর্ক। তার সাথে তিনি নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। এতে না ছিলো কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ আর না নফসের আকাঙ্ক্ষা এগুলো থেকে তাঁর দিল অতিশয় পূত-পবিত্র। সাথীরা ছিলেন তাঁর নিকট দুনিয়াবী সবকিছু থেকে অধিক পবিত্র। এমনটি কখনো হয়নি যে, তিনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কিংবা তাদের ত্যাগ করে দুনিয়াবী কোনো চাকচিক্যের প্রতি, কোনো স্বার্থ ও লাভের প্রতি কিংবা কোনো উচ্চপদ ও খ্যাতির প্রতি চোখটি তুলেও তাকিয়েছেন ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ - الكهف : ٢٨

"আর তোমার দিলকে সেই লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখো যারা নিজেদের রবের সন্তোষ লাভের সন্ধানী হয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর কখনো তাদের থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাবে না। তুমি কি দুনিয়াবী চাকচিক্য ও জাঁকজমক পসন্দ করো ?"-সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ২৮

কারণ স্পষ্ট, পরিষ্কার। তাদের সাথে সম্পর্ক শুধুমাত্র সেই সত্তার উদ্দেশ্যেই ছিলো, যার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভ ছিলো তাঁর জীবনোদ্দেশ্য। এ সম্পর্কের সামনে দুনিয়ার সমস্ত কিছু ছিলো তুচ্ছ নগণ্য। এ সম্পর্ক কোনো সাময়িক প্রয়োজনে ছিল না যে, যখন ইচ্ছা তা কায়েম করা হলো এবং যখন ইচ্ছা তা ভেঙে দেয়া হলো। যখন ইচ্ছা তা মাথায় তুলে নেয়া হলো আর যখন ইচ্ছা পদতলে পিষ্ট করা হলো এ নিবীড় সম্পর্ক আর এ মর্যাদার অনুভূতি মূলত তাঁর স্নেহ কোমলতার এক বড় উৎস।

এ সম্পর্ক আল্লাহর উদ্দেশ্যে হবার প্রেক্ষিতে তা ছিলে খুবই মূল্যবান। কিন্তু নবী করীম (স)-এর একথাও জানা ছিলো যে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো মু'মিনদের সেই জামায়াত যারা ছিলো তাঁর সঙ্গী সাথী। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে যতোটা মজ বুত, উদ্দেশ্য হাসিল হবে ততোটাই নিশ্চিত এবং তাদের নেতা তাদের সাথে যতোটা মহব্বতের সম্পর্ক রাখেন, তারই বাস্তব রূপ পরিলক্ষিত হবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। মু'মিনদের জামায়াতের এ পজিশনও তাঁর জানা ছিলো যে, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথীত্ব ও সংঘবদ্ধতার কারণেই তাঁকে কামিয়াবী দান করবেন। আর এটা সেই খোদায়ী পুরস্কার যা কেবল তাঁরই মেহেরবানীতে লাভ করা যেতে পারে। তা লাভ করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার কোনো মানুষের নেই ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ الانفال : ٦٢-٦٤

"তিনিই নিজের সাহায্য দ্বারা মু'মিনদের দিয়ে তোমার সহায়তা করেছেন এবং মু'মিনদের দিলকে পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। তুমি ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত ধন-দৌলতও যদি ব্যয় করে ফেলতে, তবু এই লোকদের দিল পরস্পরের সাথে জুড়ে দিতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহই তাদের মন পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি

বড়ই শক্তিমান ও সুবিজ্ঞ। হে নবী, তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৬২-৬৪

এরূপ মিলন ও সম্পর্কের ফলশ্রুতিতেই রাসূল (স) আরবের গোত্রীয় সম্প্রদায়সমূহের বর্ণ-বংশ ও সম্মান-সম্ভ্রমের সমস্ত প্রতিমাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে মানবীয় ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায় সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন। আকীদা ও আমলের বুনিয়াদের উপর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক এবং উম্মাহর পত্তন করেছেন। এমন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে দিয়েছিলেন যা চৌদ্দশ বছরেও মিটিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি।

আর এরি ফলশ্রুতিতে এ মুজিযা সংঘটিত হয়েছে যে, সীমা সংখ্যাহীন যতো মানুষই তাঁর সাথে এসেছে, কেউ তার বিরোধী হয়নি। কেউ তার প্রতি কোনো প্রকার অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করেনি।

সকলকে তিনি স্বীয় মহব্বতের ছায়ায় এমনভাবে জড়ো করে নিয়েছিলেন, যেমন পাখী নিজ বাচ্চাদের স্বীয় ডানার নিচে জড়ো করে নেয়। অতপর তাদের হেফাযত করেছেন। পূর্ণত্ব দান করেছেন। ডানা মেলে উড়বার যোগ্য করেছেন ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ الشعراء : ٢١٥

"এবং ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তোমার ডানা মেলে দাও (অর্থাৎ তাদের সাথে মায়া-মমতা, কোমলতা, নম্রতা ও সদয় সহানুভূতির আচরণ করো)।"

–সূরা আশ শুআরা ঃ ২১৫

খ. তালীম ও তাযকিয়া

নবী করীম (স)-এর মৌলিক কার্যাবলীর একটি ছিলো শিক্ষাদান। কিন্তু তিনি যেভাবে স্বীয় আন্দোলনের সাথীদের শিক্ষা প্রদান করেন তার তুলনা বিরল। তেলাওয়াতে আয়াতের মাধ্যমে তিনি তাদের চলমান কুরআন বানিয়ে দেন। কিতাবে তালীম এবং হিকমাতের মাধ্যমে তাদের তিনি জ্ঞান, বুদ্ধি ও আনুগত্যের মূর্তপ্রতীক বানিয়ে দেন। 'তাযকীয়ার' মাধ্যমে তাদের অন্তরাত্মাকে সর্বপ্রকার অবিচলতা থেকে পূতপবিত্র করে মানবতার মিরাজে পৌছে দেন। মাক্কী জীবনও সাক্ষী, সাক্ষী মাদানী জিন্দেগীও। দাওয়াতী কাজের পরই তাঁর সমস্ত চিন্তা ও লক্ষ্য একাজটির প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়।

'কিয়ামুল লাইল' ও 'তারতীলে কুরআনে' তাঁর সাথীদের একটি দল তাঁর পদাংক অনুসরণ করেন। একটি দল তাঁর সাথেই একাজে শরীক হতেন ঃ

وَطَآئِفَةٌ مِنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ط ـ المزمل : ٢٠

"আর তোমার সংগী-সাথীদের মধ্য থেকেও কিছুসংখ্যক লোক এ কাজ করে।"–সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০

এর একটি কেন্দ্র ছিলো 'দারে আরকাম'। এখানে তিনি (গোপনে) অবস্থান করতেন। ভাণ্ডার থেকে ইল্ম ও হেদায়াত বিতরণ করতেন। (যেমন কূপ থেকে বালতি ভরে লোকেরা পানি নেয়) তিনি কুরআন শুনাতেন। সাথীরা শিখতো। এ ছাড়াও সম্ভবত অন্যান্য ব্যবস্থাপনা সেখানে ছিলো। কোনো সীরাত গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই না ঠিক। কিন্তু কুরআন এর স্পষ্ট ইংগিত করছে। তিনি তেলাওয়াতে কুরআনের জন্য দণ্ডায়মান হতেন। সাথীদের মধ্যে চলাফেরা করে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। খবরা খবর অবগত হতেন ঃ

الَّذِىْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ۝ ـ الشعراء : ٢١٨ـ٢١٩

"তিনি সেই সময়ও তোমাকে দেখতেন, যখন তুমি দাঁড়াও। আর সিজদায় অবনত লোকদের মধ্যে তোমার গতিবিধির উপরই তিনি দৃষ্টি রাখেন।"–সূরা আশ শুআরা ঃ ২১৮-২১৯

কেবল কুরআন শুনিয়ে দেয়া বা পাঠ করে দেয়াই তাঁর কাজ ছিলো না। বরঞ্চ কুরআনকে বুঝিয়ে দেয়া এবং লোকদের চিন্তায় ও আমলে তা একাকার করে দেয়াও ছিলো তাঁর কাজ। এ উদ্দেশ্যে তিনি অল্প অল্প করে কুরআন শিক্ষা দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স) থেকে দশ বছরে সূরা আল বাকারা শিখেছি। অপর একজন সাহাবী বলেন, আমরা নবী করীম (স) থেকে কয়েকটি আয়াত শিখে সেগুলো হেফাযত করে নেয়ার পরই আবার শিখতাম। স্বয়ং কুরআনই অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তিনি ঠিক এভাবেই সাথীদের পড়িয়েছেন এবং শিখিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদানের কৌশল খুবই স্পষ্ট ঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ۝ ـ

"আর এ কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি যাতে তুমি বিরতি দিয়ে দিয়ে তা লোকদের শুনাও এবং এ গ্রন্থকে আমরা (অবস্থামত) ক্রমশ নাযিল করেছি।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৬

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ـ الفرقان : ٣٢

"অমান্যকারীরা বলে ঃ এ ব্যক্তির উপর সমস্ত কুরআন একই সময় নাযিল করা হলো না কেন ? হ্যাঁ এরূপ এ জন্য করা হয়েছে যে, আমরা এটাকে খুব ভালোভাবে তোমার মন-মগজে বদ্ধমূল করেছিলাম আর (এ উদ্দেশ্যেই) আমরা এ গ্রন্থকে এক বিশেষ ধারায় আলাদা আলাদা অংশে সজ্জিত করেছি।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৩২

একদিকে তারতীলের সাথে সাথে জ্ঞানের উৎস কুরআনের তিলাওয়াত বিশেষ করে নিশিরাত জেগে জেগে এ তিলাওয়াত। অপরদিকে ইবাদাতের পাবন্দী, বিশেষ করে নামাযে। যার উপর অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল দীন ও রাষ্ট্রের ইমারাত। এ দুটি জিনিসের মাধ্যমে তিনি তাঁর সাথীদের মন-মানসিকতা তৈরী করেছেন। তাদের অন্তরকে পবিত্র করেছেন। নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করেছেন এবং তাদের কর্মনিপুণ করেছেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি এ কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন। গোটা জীবন ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আল্লাহর যিকরকে একাকার করে দেয়ার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

ইল্‌মী, রূহানী এবং নৈতিক শিক্ষা ও পরিশুদ্ধির একাজ স্বস্থানে একাকী মোটেই যথেষ্ট হতো না, যদি না নবী পাক (স) এরি সাথে সাথে স্বীয় সাথীদেরকে বাস্তব দাওয়াত এবং ময়দানে জিহাদের কর্মতৎপরতায় লাগিয়ে দিতেন এবং সর্বপ্রকার অগ্নিপরীক্ষায় নিমজ্জিত হয়ে তাঁরা নিখাদ সোনায় পরিণত হতো। বস্তুত ঐরূপ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি কাম্যও ছিলো না। মিথ্যা খোদাদের চ্যালেঞ্জ করে, বাতিল রাষ্ট্রব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে, সার্বভৌমত্ব ও নেতৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ হবার কথা ঘোষণা করে এবং নিজের প্রতি পূর্ণাংগ আনুগত্যের দাবী করে নবী করীম (স) তাযকিয়া ও পরিশুদ্ধির প্রকৃত স্কুল খুলে দেন। প্রতিটি পদক্ষেপে সাথীদের অন্তরে একথার প্রগাঢ় বিশ্বাস জাগ্রত করে দিতে থাকেন। যে এই প্রাণান্তকর মরুভূমির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে কামিয়াবীর পথ। ঈমানের দাবীকে অবশ্যি পরখ করে দেখা হবে। পবিত্রতাকে আবিলতা থেকে অবশ্যি ছেঁকে আলাদা করে নেয়া হবে ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝-

"লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" এটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে। আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না। অথচ আমরা তো এদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যি দেখে নিতে হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।"–সূরা আল আনকাবূত ২-৩

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ط - ال عمران : ١٧٩

"আল্লাহ মু'মিনদের এ অবস্থায় কিছুতেই থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় তোমরা বর্তমানে (দাঁড়িয়ে) আছ। পবিত্র লোকদের অপবিত্র লোকদের থেকে অবশ্যি পৃথক করবেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৯

কুরআন, নামায, দাওয়াত ও জিহাদের চলমান খানকাসমূহে এবং দৌড়ে চলা স্কুলসমূহে শিক্ষা দিয়ে রাসূলে করীম (স) সেই দলটি তৈরী করেন, নিজ রবের সাথে যার সম্পর্ক ছিলো অতি নিবীড় মজবুত। নিজ ভাইদের সাথে যার সম্পর্ক ছিলো গভীর মহব্বত ও সহানুভূতির। নিজ দাওয়াত ও আন্দোলনের সাথে যার ছিলো অটুট চিরস্থায়ী সম্পর্ক। যার জন্য দরদ ছিলো অন্তর তলদেশের গভীরতা থেকে উৎসারিত।

এরি সাথে তিনি তিনটি কথার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন ঃ

এক ঃ মনোবৃত্তিতে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত সৃষ্টি করা। অর্থাৎ যা কিছুই করা হোক না কেন, তা করা হবে স্বীয় রবের জন্য। জীবনোদ্দেশ্য হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। প্রতিটি পদক্ষেপ হবে "লিওয়াজহিল্লাহ্"- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

দুই ঃ সম্পদ কুরবানীর প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করা। কারণ, মানুষের জন্য সম্পদের মোহের চেয়ে বড় কোনো ফিৎনা নেই। এ প্রেক্ষিতে নবী করীম (স) পৃথিবীতে অবস্থান করে অন্তরকে পৃথিবীর মুখাপেক্ষীহীন রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। দুনিয়া কামাই ও দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবার তৎপরতার পরিবর্তে দুনিয়াকে স্বল্প দিনের সামগ্রী এবং অহংকারের সামগ্রী হিসেবে অন্তরে চিত্রিত করার শিক্ষা দেন।

তৃতীয়ত ঃ জীবনের লক্ষ্য বিন্দুকে আখিরাতের পুরস্কারের উপর নিবদ্ধ করে দেন। একে প্রকৃত সত্যরূপে উপস্থাপন করেন। চলচিত্রের মতো এর নকশা লোকদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। লোকেরা বুঝতে পারে এ-ই হচ্ছে সর্বোত্তম পাওয়ার বস্তু আর এ-ই হচ্ছে চিরস্থায়ী পাওয়া।

এ তিনটি জিনিস বুঝানোর জন্য একদিকে চেইনের মতো কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিল হতে থাকে। অপর দিকে নবী করীম (স)-এর মজলিসও এ তিনটি জিনিসের আলোচনায় অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে থাকতো।

গ. পর্যবেক্ষণ ও ইহ্‌তেসাব

একজন নেতা ও শিক্ষককে স্বীয় সাথী ও শাগরেদদের দুর্বলতা পদস্খলন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহেরও সম্মুখীন হতে হয়। বিরাট বিরাট ভ্রান্তি ও অপরাধসমূহের সাথে নবী করীম (স) যেভাবে ক্ষমা ও দয়াশীল আচরণ করেছিলেন, তার আলোচনা তো সম্মুখে আসবে। কিন্তু এ প্রসংগেও তাঁর কোনো কোনো নীতি বড়ই মূল্যবান এবং সাংগঠনিক জীবনও সংশোধনের কাজে পরশ পাথরের ভূমিকা রাখে।

তিনি সাথীদের দুর্বলতা অনুসন্ধান করে বেড়াতেন না। এ উদ্দেশ্যে তিনি কোনো প্রকার গোয়েন্দা ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেননি। লোকদের দুর্বলতা ও দোষত্রুটি তাঁর দৃষ্টিতে না আসুক এবং লোকেরা নিজেরাই নিজেদের সংশোধন করে নিক, এ পদ্ধতিতেই তিনি যারপর নেই খুশী হতেন। লোকেরা নিজেদের (দীনি) ভাইদের ব্যাপারে তাঁর নিকট শেকায়েত করবে, এটাও তিনি নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলে দিয়েছিলেন, কারো দোষত্রুটি যেনো তাঁকে অবহিত করা না হয়। নিজ সাথীদের ব্যাপারে তিনি কখনো সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত হতেন না। যতোক্ষণ না কারো ব্যাপারে কোনো কথা স্পষ্ট প্রকাশ হতো, ততোক্ষণ তিনি তার ব্যাপারে সুধারণাই পোষণ করতেন। তাঁদের পিছনে কোনো মজলিসে তাদের বদনাম করতেন না।

অপরাধ ও ভুল-ভ্রান্তির কারণে কাউকেও তিরস্কার ও অপমানিত করার তো প্রশ্নই উঠতো না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যই ছিলো মূলকথা। অতপর শুধুমাত্র গুনাহে নিমজ্জিত হবার ফলেই কোনো ব্যক্তিকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হতো না।

এরপরও কোনো কিছু যদি তাঁর দৃষ্টিগোচর হতো, তার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় নসীহত করতেন। পরম মহব্বতের সাথে তা করতেন। এমতাবস্থায় কোনো কিছুকে উপেক্ষা করলেও চরম বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারতো। সংশোধনের ব্যাপারে একটি মামুলী ঘটনায় তাঁর মহব্বত ও হিকমতের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে। একবার একব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে মসজিদের মেঝেতে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে আরম্ভ করে। উপস্থিত লোকেরা তাকে বাধা দেয়ার জন্য মারমুখো হয়ে এগিয়ে যায়। নবী পাক (স) তাদের বাধা দিয়ে বললেন ঃ এখন প্রথমে তাকে পেশাব করা শেষ করতে দাও। অতপর সে যখন কার্য সম্পাদন করলো, তিনি তাকে কাছে ডেকে এনে বুঝালেন, এ হচ্ছে আল্লাহর ঘর, এটাকে নোংরা করা নিষেধ। অতপর সাহাবায়ে কিরামকে পানি ঢেলে দিয়ে পেশাব পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন।

কারো কোনো ভুলত্রুটি জানতে পারলে কোনো মজলিসে তিনি তা আলোচনা করতেন না। তার নাম নিয়ে ঘটনা আলোচনা করতেন না। তাকে লজ্জিত করতেন না। বরঞ্চ সাধারণত এভাবে বলতেন ঃ লোকদের কি হয়ে গেলো যে, তারা এরূপ এরূপ করে ......।

তাঁর শিক্ষা তিরস্কার এবং শাস্তি প্রদান যে সংশোধন ও ইহতেসাব থেকে খালি ছিলো, তা নয়। একবার একব্যক্তি উঁচু গম্বুজ তৈরী করে। তিনি তার সালামের জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকেন। এমনকি তার সে গম্বুজ ভেঙে চূর্ণ করে দেন। আরেকবার একব্যক্তি আরকান আহকামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তড়িঘড়ি নামায পড়ছিলো। তিনি তাকেও সমালোচনার মাধ্যমে সংশোধন করেন। যেখানে দণ্ড কার্যকর করা জরুরী ছিলো, তিনি সেখানে দণ্ড কার্যকর করেন। তবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনজন সাহাবীর বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট কার্যকর করেন। কাফ্ফারার পদ্ধতি চালু করেন। সাদকা ও সম্পদ আদায় করার মাধ্যমেও পবিত্রতা পরিশুদ্ধির কাজ করেন।

কিন্তু তাঁর ইহতেসাব কোনো দারোগা কিংবা একনায়ক শাসকের ইহতেসাব ছিলো না। তিনি স্নেহময় পিতা ও শিক্ষকের মতোই সাথীদের দেখাশুনা ও পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর মূল প্রচেষ্টা ও শিক্ষা সর্বদা এটাই ছিলো যে, লোকেরা যেনো নিজেরাই আত্মসমালোচনা করে। আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে এ অনুভূতি জাগ্রত রাখে এবং প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করে। লোকেরা যখন তাঁর নিকট এসে নিজেদের ভুল স্বীকার

করতো, তখনো তিনি তাদেরকে এদিকে ধাবিত করতেন এবং নিজেও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ النساء : ٦٤

"তারা যদি এই পন্থা অবলম্বন করতো যে, যখনই তারা নিজেদের উপর যুল্ম করে বসতো তখনই তোমার নিকট আসতো এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতো, তবে তারা অবশ্যি আল্লাহকে ক্ষমাশীল-অনুগ্রহকারী রূপে পেতো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৪

এভাবে তিনি তাদের ভুলত্রুটি দূর করতেন এবং আখিরাতে তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা পাবার পথ খুলে দিতেন। কারণ, প্রকৃত পুরস্কার তো আখিরাতের পুরস্কার এবং প্রকৃত শাস্তি তো সেখানকার শাস্তি।

ঘ. যোগ্যতা ও সামর্থ অনুযায়ী আচরণ

নেতৃত্বদান ও শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে নবী করীম (স)-এর এ দয়া ও মহব্বতের একটা দিক এও ছিলো যে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার যোগ্যতা ও সামর্থ অনুযায়ী ব্যবহার করতেন। তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে একথার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন যে, যে লোকগুলো তাঁর সাথীত্ব গ্রহণ করেছে তারা সকলে একই মান ও একই প্রকারের লোক নয়। ঈমান ও আনুগত্যের দিক থেকেও তাদের মধ্যে ফারাক রয়েছে। জ্ঞান বুদ্ধি ও শারীরিক যোগ্যতার দিক থেকেও তাদের মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা কাজে সফলতা অর্জন করতে পারে। প্রত্যেকের নিকট একই রকম দাবী করা যেতে পারে না। কারো উপর তার শক্তি সামর্থের অধিক বোঝা চাপানো তিনি পসন্দ করতেন না। মানবিক দুর্বলতার জন্য তিনি সাথীদের তিরস্কার করতেন না। বরঞ্চ এর বাস্তবতাকে মেনে নিতেন।

এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জানতে চাইলো, ইসলামের দাবী কি ? তিনি বললেন, শাহাদাত (অর্থাৎ তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদান) পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ত্রিশ দিনের রোযা, বাৎসরিক যাকাত পরিশোধ করা এবং একবার হজ্জ করা। লোকটি জিজ্ঞেস করলো ঃ এ ছাড়া আর কিছু আছে কি ? তিনি বললেন, না, আর কিছু নয়। লোকটি একথা বলতে বলতে চলে গেলো ঃ আমি এর চাইতে কমতিও করব না। বৃদ্ধিও করবো না। নবী করীম (স) সাথীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ "জান্নাতী মানুষ দেখতে চাইলে এ লোকটিকে দেখে নাও।"

কিন্তু প্রত্যেকের সাথেই তিনি এমনটি করেননি। কারো কাছ থেকে একথার বায়াত নেয়া হয় যে, তাঁর সাথে ঘরবাড়ী ত্যাগ করবে। কারো থেকে জান ও মাল বাজী রাখার ওয়াদা নেয়া হয়। কারো কাছ থেকে সওয়াল না করার প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়। কারো নিকট দাবী করা হয় রাগ ও গোস্বা নিবারণের। কারো সম্পর্কে বলা হয় হিজরত না করলে মু'মিনদের মধ্যে গণ্য হবে না। কারো সম্পর্কে বলা হয় যদিও সে নামায পড়ে রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, কিন্তু কতিপয় অপরাধের জন্য সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আবার কোথাও এতোটুকু বলাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আমাদের কিবলাকে কিবলা বানালো এবং আমাদের যবেহ করা পশু (গোশত) খেলো, সে আমাদের দলভুক্ত।

এরূপ কর্মপন্থার ফলেই বিভিন্ন ধরনের লোকেরা তাঁর সাথী হয়েছে। তাঁর সাথে চলেছে ঈমান, আমল যোগ্যতা ও সামর্থের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত ছিলো যে, সে যা কিছু দিচ্ছে, তা কবুল করা হচ্ছে।

ঙ. কোমলতা ও সহজতা

তাঁর কোমলতার একটি উল্লেখযোগ্য দিক এ ছিলো যে, তিনি সাথীদের জন্য পরম কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পবিত্র হৃদয়ের অবস্থাতো এরূপ ছিলো যে, তাতে সত্য পথের সাথীদের জন্য কঠোরতা ও বল প্রয়োগের লেশমাত্র ছিলো না। অপরদিকে তাঁর আচার-আচরণ, ব্যবহার-মুয়ামিলাত, কথাবার্তা এবং কর্মপদ্ধতিতে ছিলো না কোনো প্রকার কঠোরতা, অভদ্রতা এবং বদমেজাজী। এর ফলশ্রুতিতে যে-ই তাঁর নিকট এসেছে, তাঁর দলে শামিল হয়ে গেছে। তাঁর পদাংক ত্যাগ করেনি। তাঁর ইংগিতে জান ও মাল কুরবানী করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। এর চিত্র এঁকেছে কুরআন এভাবে—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ـ ال عمران : ١٥٩

"(হে নবী!) এটা আল্লাহর বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের। অন্যথায় তুমি যদি উগ্রস্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এসব লোক তোমার চারদিক থেকে সরে যেতো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯

রাসূলে করীম (স)-এর কোমলতা, সহজতা ও ধীরতার ঘটনাবলী বেশুমার। এর উদাহরণ রয়েছে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে, সাংগঠনিক জিন্দেগীতে, সংগীন ও সংকটকালে, বন্ধুদের সাথে এবং শত্রুদের সাথেও।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বহু বছর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর খিদমত করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল আমাকে না কখনো ধমক দিয়েছেন আর না তিরস্কার করেছেন। এমনকি এরূপ কেনো করলে এবং এরূপ কেন করলে না ? এমনটিও বলেননি কখনো। যে কোনো সাধারণ মুসলিম এমনকি একজন বৃদ্ধাও তাঁর পথচলা থামিয়ে দিতে পারতো। তিনি দাঁড়িয়ে পূর্ণ মনোযোগের সাথে তাঁর সব কথা শুনতেন। সমাধান করতেন তার সমস্যা। ঋণদাতা এসে গলার চাদর ধরে টানতো। তিনি মুচকি হেসে তাঁর অপরাধ উপেক্ষা করতেন। সাথীরা বাধা দিতে গেলে তিনি বলতেন, তাকে বলতে দাও, করতে দাও। কারণ তার অধিকার আছে।

লোকেরা তাঁর মজলিসে আসতো। সম্বোধন, সালাম এবং কথাবার্তায় ভাষার মারপ্যাঁচে তাঁকে গালি দিতো এবং নিন্দা করতো। কিন্তু তিনি যে শুধু এর জবাবই দিতেন না, তা নয়। বরঞ্চ তিনি এসব পুরোপুরি উপেক্ষা করতেন। যদি জবাব দিতেনও তবে এভাবে দিতেন, কেবল বদনিয়তের লোকেরাই নিজেদের আমল দ্বারা অপরকে আঘাত দেয়। তার সাথে এরূপ আচরণ করত ইহুদী সরদার এবং আলেমরা। তারা "আসসালামু আলাইকা"-কে "আসসামু আলাইকা" (তোমার মৃত্যু হোক) বানিয়ে ফেলতো। এর জবাবে নবী করীম (স) বলতেন, "অ-আলাইকুম"। হযরত আয়েশা (রা) তাদের এ বাক্যে চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, মৃত্যু তোদের আসুক। তোদের উপরই পড়ুক আল্লাহর অভিশাপ। নবীপাক (স) বললেন, "হে আয়েশা! মুখ খারাপ করা ও খারাপ কথা বলা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না।" হযরত আয়েশা (রা) বললেন, ওগো আল্লাহর রাসূল আপনি কি শুনতে পাননি এ লোকগুলো কি বলেছে ? তিনি বললেন, আর তুমি কি শুনোনি আমি তাদের কি জবাব দিয়েছি ? আমি বলেছি "তোমাদের উপরও।"[১]

তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিলো বিস্ময়কর। লোকেরা তাঁর মজলিসে তাঁর সাথে সাক্ষাতকালে, কথাবার্তায়, সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ভোগ করতো। অশিক্ষিত লোকেরা তো ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের সীমা ছাড়িয়ে যেতো। এতে

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, সূরা মুজাদিলা, টীকা ২২ বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে উদ্ধৃত।

তিনি দারুণ মনোকষ্ট পেতেন। কিন্তু সব সয়ে যেতেন। ধৈর্যধারণ করতেন। কোনো কঠোর কিংবা অসৌজন্যমূলক কথা তাঁর পবিত্র জবান থেকে বের হতো না। এ ধরনের সকল অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী এসে লোকদের ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও সৌজন্য শিক্ষা দিতো। লোকদের খাবার দাওয়াত দিতেন। কেউ কেউ খাবার শেষ করে বসে থাকতো, গল্পগুজব করতো। এতে যে নবী পাকের কষ্ট হতো সেকথার পরোয়াই তারা করতো না। এ অবস্থাকেও তিনি নীরবে বরদাশত করতেন। হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহ উপলক্ষে অলীমা অনুষ্ঠান সম্পর্কে সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাতের বেলায় লোকদের অলীমার দাওয়াত দেয়া হয়। সাধারণ লোকেরা খাবার শেষ করে বিদায় হয়ে যায়। কিন্তু দুই তিন ব্যক্তি বসে বসে কথাবার্তা বলতে থাকে। মানোক্ষুণ্ন হয়ে রাসূল (স) অন্যান্য বিবিদের হুজরা সমূহের দিক থেকে ঘুরে ফিরে আসেন। ঘুরে এসেও দেখতে পান, তারা বসেই আছে। তিনি ফিরে চলে যান। হযরত আয়েশার কক্ষে গিয়ে বসেন। রাতের বেশ কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর যখন জানতে পারলেন, তারা চলে গেছে, তখন তিনি হযরত যয়নবের কক্ষে তাশরীফ আনেন। (তাফহীমুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১২০। মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে জারীর এর সূত্রে উদ্ধৃত) এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আসমান থেকে হেদায়াত আসে।

فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَانِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ

فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ز وَاللّٰهُ لَايَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ط ـ الاحزاب : ٥٣

"কিন্তু তোমাদের খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাও। কথায় মশগুল হয়ে বসো না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।"–সূরা আল আহ্যাব ঃ ৫৩

এমনি করে কোনো কোনো লোক সময় অসময় সাক্ষাতের জন্য এসে হুজুরের হুজরার পাশে গিয়ে তাঁকে ডাকাডাকি করতো। এতে তিনি খুবই কষ্ট পেতেন। কিন্তু মহত ব্যক্তিত্বের কারণে এ আচরণকেও তিনি সহ্য করতেন। মাওলানা মওদূদী লেখেন ঃ

"নবী করীম (স)-এর সাহচর্যে থেকে যেসব লোক ইসলামী নিয়মনীতি ও আদব কায়দার প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন, তাঁরা তার সময়ের প্রতি সবসময়ই লক্ষ্য রাখতেন। তিনি আল্লাহ তাআলার দীনের কাজে

কতোখানি ব্যস্ত জীবনযাপন করেন, সে বিষয়ে তাঁরা পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁরা বুঝতেন, রাসূলে করীম (স)-কে শ্রান্ত-ক্লান্তকারী এসব কঠিন ব্যস্ততার মধ্যে কিছুটা তাঁর আরাম ও বিশ্রামের জন্য কিছু সময় তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততার জন্য এবং কিছুটা সময় তাঁর পারিবারিক জীবনের কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু অনেক সময় এমন সব অভদ্র ও শালীনতাবর্জিত অসামাজিক লোকও তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে উপস্থিত হতো, যাদের ধারণা ছিলো আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার ও সমাজ সংস্কারের কাজকর্ম যারা করে তাদের একটু সময় বিশ্রাম গ্রহণেরও প্রয়োজন নেই। অতএব দিনরাত যখন ইচ্ছা তাদের নিকট এসে উপস্থিত হবার অধিকার যে কোনো লোকের রয়েছে। এ কারণে সেই লোকদের কর্তব্য হলো, যখনই তাদের নিকট সাক্ষাত প্রার্থীরা উপস্থিত হবে, তখনই তাদের সাথে সাক্ষাত দিতে অবশ্যি প্রস্তুত থাকতে হবে। এ মনোভাবের লোকদের মধ্যে সাধারণত এবং আরবের বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে কোনো কোনো লোক এতোটা অভদ্র ও অশালীন হতো, যারা রাসূলে করীমের সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে কোনো খাদেমের মাধ্যমে ভিতরে খবর পাঠাবার কষ্টটুকু স্বীকার করতেও প্রস্তুত হতো না। বরঞ্চ তারা নবী বেগমদের কক্ষসমূহের চারদিকে ঘোরাঘুরি করে বাইরে থেকেই নবী করীম (স)-কে ডাকাডাকি করতে থাকতো।"[১]

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ ○ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ـ الحجرات : ٤ـ٥

"(হে নবী!) যেসব লোক তোমাকে হুজরার বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ। তোমার বাইরে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো, তবে এটা তাদের জন্যই ভালো ছিলো। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং করুণাময়।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ৪-৫

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ আসলামীর বর্ণনানুযায়ী কোনো কোনো লোক এমন ছিলো যে, নবী করীম (স)-এর মজলিসে দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে থাকতো। তারা সর্বশেষ সময়টি পর্যন্ত বসে থাকার চেষ্টা করতো। এতে অনেক সময় নবী করীম (স)-এর কষ্ট হতো। এতে তাঁর বিশ্রাম এবং কাজ

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হুজুরাত, টীকা ঃ ৬।

কর্মে ব্যাঘাত ঘটতো।"[১] কিন্তু নবী করীম (স)-এর ব্যক্তিত্ব, সহনশীলতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এসব কিছুকে নীরবে সয়ে যেতো। এমনি করে নবী করীম (স) একদিকে তো প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্য ও প্রয়োজন পূরণে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকতেন। এমনকি এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য ছিলো, কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করা আমার মসজিদে দুইমাস ইতেকাফ করার চেয়েও আমার নিকট বেশী প্রিয়। অপরদিকে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তিনি প্রত্যেকটি লোকের কথা শ্রবণ করতেন। কেউ তাঁর সাথে একান্তে কথা বলতে ইচ্ছা করলে তার ইচ্ছাও পূর্ণ করতেন। বিন্দুমাত্র বিরক্ত হতেন না। সাধারণভাবে তিনি মুসলমানদের কথায় বিশ্বাস রাখতেন। এরূপ নরম ও সহজ স্বভাবের জন্য মুনাফিকরা তাকে দোষারোপ করতো। তারা বলতো, লোকটি বড় কান কাঁচা! যার ইচ্ছা হয়, তাঁর নিকটই উপস্থিত হয় এবং সে যা ইচ্ছা কথাবার্তা বলে তার কান ভরে দেয় এবং তিনি তার কথা বিশ্বাস করেন।"[২]

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ط قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ط ـ التوبة : ٦١

"এদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের কথাবার্তা দ্বারা নবীকে কষ্ট দেয়। তারা বলে, এই ব্যক্তি বড় কান কথা শুনে। বলো ঃ তিনিতো তোমাদের ভালোর জন্যই এরূপ করেন। আল্লাহর প্রতি তিনি ঈমান রাখেন এবং ঈমানদার লোকদের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি তাদের জন্য রহমতের পূর্ণ প্রতীক, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৬১

এটাও তাঁর অতিশয় রহমদিল ও অনুগ্রহশীল হবারই ফলশ্রুতি যে, লোকেরা কেউ বড়াই করার জন্য কেউ গুরুত্বহীন প্রয়োজনে, আবার কেউ বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ কারণে তাঁর সাথে একান্তে কথাবার্তা বলতে চাইতো। যায়েদ ইবনে আসলামী বলেন ঃ "যে লোকই গোপনে একাকীত্বে নবী করীম (স)-এর সাথে কথা বলার আবেদন জানাতো তিনি তাকেই সুযোগ দিতেন। কাউকেও বঞ্চিত করতেন না। ফলে যারই ইচ্ছা হতো এসে

১.মাওলানা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মুজাদিলা, টীকা ঃ ২৭। সূত্র ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর।

২. তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা মওদূদী ঃ সূরা আত তাওবা, টীকা ঃ ৬৯।

বলতো, আমি একটু একান্তে কথা বলতে চাই, তিনি তখনই তার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি অনেক লোক এমনসব কথার জন্যও একাকীত্বের দাবী করে তাঁকে কষ্ট দিতো, যে জন্য একাকীত্বের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিলো না।"[১] এ অবস্থার প্রেক্ষিতে এক সময় তো আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশই দিয়ে দেন যে, কেউ একাকীত্বে নবীর সাথে কথা বলতে চাইলে প্রথমে নবীকে উপঢৌকন দিতে হবে। অবশ্য এ নির্দেশ সহসাই মনসূখ করা হয়। কিন্তু এতে নবী করীম (স)-এর পরম কোমলতার ছবি অংকিত হয়ে যায় এবং শিক্ষাদানের কাজও পূর্ণ হয়।

সাধারণ দৈনন্দিন জীবন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক যিন্দেগী থেকে অগ্রসর হয়ে আন্দোলনের বিভিন্ন সংকটময় অবস্থা ও কার্যক্রমে এবং তাঁর কোমলতা ও সহজতা সর্বকিছুকে পরিবেষ্টন করে নিতো। চাই তা নিষ্ঠাবান সাথীদের দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি হোক, কিংবা হোক তা মুনাফিকদের তৎপরতা। সূরা আলে ইমরানের যে আয়াতটিতে তাঁর কোমলতাকে 'রহমত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তা নাযিল হয়েছিলো উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে। তখন অবস্থা এরকম ছিলো যে, মুনাফিকদের দল সর্বপ্রকারে তাঁকে এবং তাঁর জামায়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে কোনো প্রকার ত্রুটি করেনি। অপরদিকে মু'মিনদের একটি গ্রুপও দুনিয়ার লোভে তাঁর নির্দেশ লংঘন করে বসে। অর্জন করা বিজয় হাতছাড়া হয়ে যায়। এ সময় যদি তিনি মুনাফিকদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন, তাদের শাস্তি প্রদান করতেন এবং দোষী মু'মিনদের প্রতি কঠোর হতেন, তবে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ সঠিক ও যথার্থ হতো সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি গ্রুপের অপরাধকে তিনি গুরুত্বই দেননি, বরঞ্চ উপেক্ষা করেন। এতে করে শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যকার বিরাট সংখ্যক লোক নিষ্ঠাবান হয়ে যায়। আরেকটি দলকে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং আল্লাহও তাদের ক্ষমা করে দেন। শেষ পর্যন্ত এরা ইসলামের প্রাণোৎসর্গকারী সৈনিক বলে প্রমাণিত হয়। সাজা ও কঠোরতার নীতি অবলম্বন করলে তো তারা দলছুট হয়ে যেতো। বস্তুত তাদের আল্লাহর নাফরমানীর পথে বেরিয়ে যাওয়াও একজন পথপ্রদর্শকের ত্রুটি বলে নগণ্য হতো এবং তাদের বিপথগামী হয়ে যাওয়াটা তাঁর দল ও সংগঠনের জন্যও ক্ষতিকর হতো ঃ

حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ

১. মাওলানা মওদূদী ঃ তাফহীমূল কুরআন ঃ সূরা মুজাদালা ঃ টীকা-২৯।

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○ـ ال عمران : ١٥٢

"কিন্তু তোমরা যখন দুর্বলতা প্রদর্শন করলে এবং নিজেদের কাজে পরস্পর মতপার্থক্য করলে এবং যখনি আল্লাহ্ তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন যার ভালোবাসায় তোমরা বাঁধা ছিলে (অর্থাৎ গনীমতের মাল) তখন তোমরা তোমাদের নেতার আদেশের বিরোধিতা করে বসলে। কেননা তোমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক দুনিয়ার (স্বার্থের) সন্ধানকারী ছিলো আর কিছুসংখ্যক লোক ছিলো পরকালের সন্ধানকারী। তখন আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের মুকাবিলায় তোমাদের পশ্চাদবর্তী করে দিলেন, যাতে করে তিনি তোমাদের যাচাই পরীক্ষা করতে পারেন। আর সত্য কথা হলো, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমাই করলেন, কেননা ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা বড়ই অনুগ্রহের দৃষ্টি রেখে থাকেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫২

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ

مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○ال عمران : ١٥٥

"তোমাদের মধ্যে যারা মুকাবিলার দিন পিছনে ফিরে গিয়েছিলো, এর কারণ এই ছিলো যে, তাদের কোনো কোনো দুর্বলতার সুযোগে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিলো। আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, ধৈর্যধারণকারী।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৫

ইসলামী আন্দোলনকে যে নাজুক ও সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, তার প্রেক্ষিতে একথা আবশ্যকীয় করে দেয়া হয় যে, দলীয় কাজকর্ম বিশেষ করে জিহাদ থেকে নিজে নিজেই কেউ বসে পড়তে পারবে না। যতোক্ষণ না নবী করীম (স) এর নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করবে। আর অনুমতি দেয়া বা না দেয়ার এখতিয়ার তাঁকে দিয়ে দেয়া হয়েছিলো ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ

لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَرَسُوْلِهٖ ج فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ط ـ النور : ٦٢

"মু'মিন মূলতই তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর থেকে মেনে নেয়। আর কোনো সামষ্টিক কাজে যখন তারা রাসূলের সাথে একত্রিত হয় তখন তারা তাঁর অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। (হে নবী!) যেসব লোক তোমার নিকট অনুমতি চায়, তারাই আল্লাহ ও রাসূলকে মানে। অতএব তারা যখন নিজেদের কোনো কাজের কারণে অনুমতি চাইবে তখন তুমি যাকে ইচ্ছা অনুমতি দান করো। আর এই ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের দোয়া করো।"–সূরা আন নূর ঃ ৬২

কিন্তু তাঁর নীতি এই ছিলো যে, তিনি লোকদের সর্বপ্রকার ওযর কবুল করতেন। সত্যিকার ওযরসমূহতো স্পষ্টই ছিলো। জিহাদের পূর্বে কিংবা পরে মুনাফিকরা যেসব ওযর পেশ করতো, তিনি সেগুলো কবুল করে নিতেন। অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়ে দিতেন, কিংবা তাদের তৎপরতাকে ক্ষমা বা উপেক্ষা করতেন। কুরআন মজীদ পরম মহব্বত ও স্নেহশীল বাক্যের মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং সাথে সাথে দয়া ও কোমলতার ছবি তুলে দিয়েছে ঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ ـ التوبة : ٤٣

"(হে নবী!) আল্লাহ তোমায় ক্ষমা করুন। তুমি কেন এই লোকদের বিরত থাকার অনুমতি দিলে ?"–সূরা আত তাওবা ঃ ৪৩

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী লিখেছেন, "লোকদের দোষক্রটি উপেক্ষা করা মহৎ ব্যক্তিত্বের এক আবশ্যকীয় দাবী। নবী করীম (স) যেমনিভাবে সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠগুণ বৈশিষ্ট্যের প্রতীক ছিলেন, তেমনি করে লোকদের দোষক্রটি উপেক্ষা করার গুণটি তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিলো। মুনাফিকরা তাঁর ব্যক্তিত্বের এ মহত্ব থেকে অবৈধ ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করতো। দীনি কর্তব্য, বিশেষ করে জিহাদের দায়িত্ব থেকে সরে থাকার জন্য তারা তাঁর খেদমতে নানা ধরনের মিথ্যা ওযর পেশ করে ঘরে বসে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করতো। নবী করীম (স) এসব মনগড়া ওযর সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত থাকতেন। কিন্তু পরম অনুগ্রহ ও দয়াশীলতার কারণে তিনি তাদের মাফ করে দিতেন এবং অনুমতি প্রদান করতেন।

সতর্কীকরণের ভাষা কতইনা সান্ত্বনাদায়ক। কথার সূচনাই করা হয়েছে ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে অর্থাৎ একথা পরিষ্কার করে দেয়া হচ্ছে যে, তিরস্কার করা উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ দৃষ্টি আকর্ষণই উদ্দেশ্য।"[১]

কোনো কোনো মুনাফিকের দুশমনি যখন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিলো তখনো তিনি তাদের সাথে ধৈর্য, সহশীলতা এবং ক্ষমা ও হিকমতের আচরণ করেন। বিশেষ করে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর সাথে তিনি যে মহৎ ও কোমল আচরণ অবলম্বন করেছিলেন, তাতে নেতৃত্বের ব্যাপারে বহু মূল্যবান শিক্ষা নিহিত রয়েছে।

ঘটনা খুবই দীর্ঘ। কিন্তু বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।[২] "সকল প্রকার শত্রুতা-অসততা, ষড়যন্ত্র ও গাদ্দারীর পর ৬ষ্ঠ হিজরীতে বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের প্রাক্কালে সে এমন একটি ফিতনা সৃষ্টি করে যা মুসলিমদের সংগঠনকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারতো। একদিকে সে আনসার ও মুহাজিরদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করতে চেষ্টা করে। অপরদিকে মুনাফিকদের সাথে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে যে, মদীনায় পৌছে নবী পাকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সে বলে, 'নিজের কুকুরকে খাইয়ে পরিয়ে মোটাতাজা করেছ তোমাকেই ছিন্নভিন্ন করার উদ্দেশ্যে।' এ উপমাটা আমাদের ও এ কুরাইশ কাংগালদের [মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীদের] ব্যাপারে হুবহু খেটে যায়। তোমরাই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো। হাত গুটিয়ে নাও। তখন এরা ছিন্নমূল হয়ে পড়বে আল্লাহর শপথ! মদীনায় পৌছার পর আমাদের সম্মানিত পক্ষহীন লাঞ্ছিত পক্ষকে বহিষ্কৃত করবে।"

নওজোয়ান আনসার সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম এ ঘটনার রিপোর্ট রাসূলে করীম (স)-এর নিকট পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। অবদুল্লাহ ইবনে উবাই সুস্পষ্ট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। হযরত উমার (রা) তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করে দেয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু নবীপাক বললেন ঃ "না তা করো না। লোকেরা বলবে, মুহাম্মাদ নিজেই তার সাথীদের হত্যা করেছে।" তাঁর এই কর্মকৌশলের ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় যে, সকল আনসার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর বিরুদ্ধে গোস্বায় ফেটে পড়ে। এমনকি শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, কাফেলা যখন মদীনায় প্রবেশ

---

১. তাদাব্বুরে কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড লাহোর ১৯৭৮ ইং পৃঃ ১৭২

২. বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা মওদূদীর তাফহীমুল কুরআন, সূরা মুনাফিকুনের ভূমিকা ও টীকা দ্রষ্টব্য

করছিলো, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইরই পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নগ্ন তরবারি উত্তোলিত করে বাবার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেন, "আপনি বলেছিলেন মদীনা পৌঁছে সম্মানিতরা অসম্মানিতদের বহিষ্কৃত করবে। কিন্তু সম্মানিত আপনি, না আল্লাহ ও তাঁর রসূল তা আপনি এখনি জানতে পারবেন। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না।" অতপর রাসূলের অনুমতি পেয়ে হযরত আবদুল্লাহ (রা) তার পথ ছেড়ে দেন এবং তরবারি কোষবদ্ধ করেন। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদীনায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

এ সময় আল্লাহ তাআলা এ ফরমান নাযিল করেন যে, এ ধরনের মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা নেই। অবশ্য নবী করীম (স) তাঁর পরম দয়াশীলতার কারণে এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[১] অতপর তবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে আল্লাহ তাআলা আরো কঠোরভাবে জানিয়ে দেন যে, হে নবী! আপনি এদের জন্য সত্তরবার ক্ষমা চাইলেও এ ধরনের খোদার দুশমনদের ক্ষমা করা হবে না ঃ

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط - التوبة : ٨٠

"(হে নবী!) তুমি এই লোকদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও, এমনকি সত্তর বারও যদি এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবু আল্লাহ কিছুতেই ওদের ক্ষমা করবেন না।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৮০

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী লিখেছেন ঃ

"নবী করীম (স) ছিলেন দয়া, অনুগ্রহ ও করুণার মূর্তপ্রতীক এ কারণেই সকল শত্রুরা ষড়যন্ত্র, ফিতনা ফাসাদ করা সত্ত্বেও মুনাফিকদের সংশোধন ও নাজাত তাঁর নিকট এতোটা প্রিয় ছিলো। যেমন গোটা উম্মতের জন্য প্রতিনিয়ত তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তেমনি করে তাদের জন্যও নাজাতের দোয়া করতেন।"[২]

---

১. দ্রষ্টব্য সূরা মুনাফিকুন ঃ ৬।

১. তাদাব্বুরে কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড পৃঃ ২০৩।

এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর মতো মুনাফিকের যখন মৃত্যু হয় তখনো তার প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার সীমা ছিলো না—তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম। তিনি নবী পাকের খেদমতে হাজির হয়ে পিতার কাফনের জন্য তাঁর জামাটি প্রার্থনা করেন। তিনি পরম উদারতার সাথে তা প্রদান করেন। অতপর হযরত আবদুল্লাহ পিতার জানাযা পড়ানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি জানাযা পড়ানোর জন্য যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। হযরত উমার বারবার বলছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এমন এক ব্যক্তির জানাযা পড়বেন যে এই এই করেছিলো ? কিন্তু তাঁর কথা শুনে নবীপাক (স) মুচকি হাসছিলেন এবং নিজের সে পরম দয়া ও করুণার কারণে যা দোস্ত ও দুশমন সকলেরই জন্য নিবেদিত ছিলো, তিনি এই নিকৃষ্টতম শত্রুর জন্য দোয়া করতে দ্বিধা করেননি।[১]

অবশেষে তিনি যখন তার জানাযায় দাঁড়িয়ে যান তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ[২]

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ط إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ - التوبة : ٨٤

"আর ভবিষ্যতে তাদের কোনো লোকের মৃত্যু হলে তার জানাযা তুমি কখনো পড়বে না। আর তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।"—সূরা আত তাওবা ঃ ৮৪

চ. ক্ষমা ও মার্জনা

বন্ধু ও শত্রু নির্বিশেষে সকলের জন্য তাঁর দয়া ও ক্ষমার আচরণ ছিলো। তাতেও তাঁর অনুগ্রহশীলতাই প্রকাশিত। তাঁর কোমলতার কথা উল্লেখ করার পরপরই এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্বভাবের এক বিস্ময়কর দিক হচ্ছে যে, অনেক সময় শত্রুকে ক্ষমা করে দেয়া তার জন্যে সহজ। কিন্তু আপনজন ও প্রিয়জনকে ক্ষমা করাটা খুব কঠিন হয়ে

---

১. একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, যখন তাঁকে সূরা আত তাওবার পূর্বোক্ত আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন তিনি বলেছিলেন আমি যদি জানতাম, সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করলে মাফ করা হবে, তবে আমি তাই করতাম।

২. মাওলানা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন সূরা আত তাওবা টীকা ঃ ৮৮

দাঁড়ায়। নবী পাকের এ গুণটিও সকলেরই জন্য ছিলো সমান। শত্রুদের ক্ষমা করে দেয়ার আলোচনা তো আগেই করেছি। আপন লোকেরা নৈতিক ও আইনগত কোনো ভুলত্রুটি করলে, তিনি চাইতেন তা যেনো তাঁর 'নলেজে' না আসে। নলেজে আসলেও শাস্তি যেনো না দিতে হয়। শাস্তি দিতে হলেও কাফ্‌ফারা দ্বারাই যেনো ব্যাপারটা সেরে যায়। আন্দোলনী ভুলত্রুটির জন্য তাঁর আচরণ এর চেয়ে ভিন্নতর ছিলো না।

হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতায়ার ঘটনা খুবই মশহুর। কুরাইশের লোকেরা যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভংগ করে বসলো, তখন নবী করীম (স) মক্কার উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু তিনি কোথায় অভিযান চালাতে চান, তা কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী ছাড়া আর কাউকে জানাননি। ঘটনাবশত সে সময় বনু আবদুল মুত্তালিবের এক দাসী আর্থিক সাহায্যের জন্য মদীনা আসে। সে মক্কায় ফিরে যাবার সময় হযরত হাতিব (রা) তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং কতিপয় কাফির সরদারের নামে লিখিত একখানা চিঠি সংগোপনে তার কাছে দেন। আর সে যাতে এ গোপন তথ্য প্রকাশ না করে দেয় এবং চুপেচাপে চিঠিটি সংশ্লিষ্ট লোকদের কাছে পৌছে দেয়, সেজন্য তাকে দশটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে দেন। স্ত্রীলোকটি মদীনা থেকে রওয়ানা হতেই আল্লাহ তাআলা ব্যাপারটি তাঁর নবীকে জানিয়ে দেন। সাথে সাথে তিনি হযরত আলী, যুবায়ের এবং মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা)-কে তার পিছে পাঠিয়ে দেন.....। (তাঁরা চিঠিটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন) এবং নবী করীম (স)-এর খিদমতে তা হাজির করেন। চিঠি খুলে পড়া হলো। দেখা গেলো, তাতে কুরাইশদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, নবী করীম (স) তোমাদের আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। রাসূলে পাক (স) হযরত হাতিবকে জিজ্ঞেস করলেন, হে হাতিব! এ কেমন কাজ ? তিনি বললেন, আমার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আমি যা কিছু করেছি, তা এজন্যে করিনি যে, আমি কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেছি এবং ইসলামকে বাদ দিয়ে এখন কুফরকে পসন্দ করতে শুরু করেছি। আসল ব্যাপার হলো আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন মক্কায় অবস্থান করছে। আমি কুরাইশ বংশের লোক নই। কয়েকজন কুরাইশ বংশীয় লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় আমি সেখানে বসবাস করতাম মাত্র। অন্যান্য মুহাজিরদের পরিবার পরিজনও সেখানে আছে বটে, কিন্তু আশা করা যায় তাদের গোত্রের লোকেরাই তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু আমার কোনো গোত্র সেখানে নেই। ফলে আমার পরিবার পরিজনের লোকদের রক্ষা করারও

কেউ সেখানে নেই। এ কারণে আমি চিঠিটি সেখানে পাঠিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এতে করে কুরাইশদের প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ থাকবে এবং এ কারণে তারা আমার লোকজনকে অসুবিধায় ফেলবে না ....। রাসূলে করীম (স) হযরত হাতিবের বক্তব্য শুনে বললেন, হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথাই বলেছে অর্থাৎ এ কাজের প্রকৃতি কারণ এটাই, ইসলাম পরিত্যাগ ও কুফরীর সাহায্য সহাযোগিতার মানসে তিনি এমনটি করেননি। হযরত উমর ফারুক দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বিখণ্ডিত করে দিই। সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নবী করীম (স) বললেন, এই ব্যক্তি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জানো হতে পারে আল্লাহ তাআলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্বোধন করে বলে দিয়েছেন যে, "তোমরা যাই কর না কেন আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।".... একথা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন আল্লাহ এবং রাসূলই সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন।"[১]

মৌলিক কথা ছিলো এই যে, কে নিজের লোক এবং কার কর্ম-তৎপরতার রেকর্ড কি ? বুনিয়াদী দিক থেকে যে নিজের লোক আনুগত্যকারী এবং আন্তরিকতা সম্পন্ন, তার জীবন মূলত আনুগত্যের জীবন। সে বড় কোনো ভুল করলেও যা যে কোনো আইনের দিক থেকে গাদ্দারীর সংজ্ঞায় পড়ে, দয়া ও কোমলতা লাভের অধিকারীই থাকে। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে কিনা তা নির্ভর করবে সাংগঠনিক অবস্থার উপর। কিন্তু শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দেয়া এবং পাকড়াও করার পরিবর্তে ছেড়ে দেয়া অধিকতর উত্তম ও কল্যাণবহ। প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, নবী করীম (স) সমালোচনা ও শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই কোমল ও দয়ার অধিকারী। আর ক্ষমা করে দেয়ার ব্যাপারে ছিলেন মহান উদার।

ছ. পরামর্শ

"কোমলতা ও ক্ষমার কথা আলোচনার পরপরই কুরআন তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিক উন্মুক্ত করে। আর তা হচ্ছে এই যে, তিনি আন্দোলনের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাথীদের শরীক রাখতেন, তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁর জীবন ছিলো "ওয়া শা-বিরহুম ফীল আম্‌র"-এর বাস্তব সাক্ষ্য। ব্যাপার এমন

১. মাওলানা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মুমতাহিনা, টীকা : ১। সূত্র: মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি।

ছিলো না যে, তিনি পরামর্শ গ্রহণের মুখাপেক্ষী ছিলেন। একদিকে তিনি অহীর মাধ্যমে পথনির্দেশ লাভ করেছিলেন। অপরদিকে তাঁর সীনা মুবারক ছিলো ইল্‌ম ও ফায়সালা গ্রহণের সঠিক যোগ্যতা ক্ষমতার (ইল্‌ম ও হিকমতের) নূরে পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, কোনো দল ততোক্ষণ পর্যন্ত শক্তি লাভে সক্ষম হতে পারে না, যতোক্ষণ না তার সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শরীক হবে। একথার প্রমাণ হিসেবে তাঁর জীবন থেকে অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা এখানে মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

মদীনায় তাশরীফ আনার পর বদর যুদ্ধের ঘটনা ছিলো তাঁর প্রথম সংকটজনক ঘটনা। শক্তিতে দুর্বল, সংখ্যায় নগণ্য এবং সওয়ারী না থাকার মতো। মুহাজিরগণ নিজেদের ঘরদোর ত্যাগ করে এখানে আসেন। আনসারদের এ বাইয়াত হয়েছিলো যে, শত্রু হামলা করলে তারা জীবন বাজী রেখে লড়াই করবে। এখন একদিকে ছিল কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলা। অপরদিকে কুরাইশদের সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী, দাওয়াত ও আন্দোলনের দীর্ঘ কর্মকৌশলের দাবী তখন এই ছিলো যে, কুরাইশের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে লড়াই করে তাদের শক্তি খর্ব করে দেয়া হবে। স্বয়ং আল্লাহর ইচ্ছাও এটাই ছিলো। তিনি যদি নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে এরূপ নির্দেশ দিতেন, তবু সাহাবায়ে কিরাম তাঁর নির্দেশ পালনে সামান্যতম ত্রুটি করত না। কিন্তু তিনি মুহাজির ও আনসারদের ডেকে একত্র করেন। সমস্যা তাদের সম্মুখে তুলে ধরেন। মুহাজিরদের মধ্য থেকে হযরত মিকদাদ ইবনে আমর আরয করেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যেদিকে আপনার রব আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি সেদিকে চলুন আমরা আপনার সাথে রয়েছি। 'আমরা বনী ইসরাঈলের মতো একথা বলব না যাও তুমি আর তোমার রব লড়াই করো, আমরা এখানে বসে থাকবো।' বরঞ্চ আমরা বলছি ঃ চলুন, আপনি এবং আপনার রব লড়াই করুন আমরাও আপনার সাথে রয়েছি। আমাদের একজন লোক জীবিত থাকা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে আপনার সাথে শরীক থাকবো।" নবী করীম (স) এতেও ফায়সালা ঘোষণা করলেন না। আনসারদের বক্তব্য শুনার অপেক্ষা করলেন। অতপর আনসারদের মধ্য থেকে হযরত সাআদ বিন মুয়ায (রা) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যাকিছু আপনার সিদ্ধান্ত তাই করুন। কসম সেই সত্তার যিনি সত্য সহকারে আপনাকে প্রেরণ করেছেন। আপনি যদি আমাদের নিয়ে সম্মুখের সমুদ্র তীরে উপনীত হন এবং তাতে নেমে পড়েন, আমরা অবশ্যি আপনার সাথে থাকবো। আমাদের একজন লোকও

পিছে থেকে যাবে না।" অতপর রাসূল (স)-এর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মুকাবিলার কথা ঘোষণা করেন।

উহুদের যুদ্ধের (৩য় হিজরী) প্রাক্কালে যখন প্রশ্ন দেখা দিলো শহরে অবরুদ্ধ থেকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে, নাকি শহর থেকে বাইরে গিয়ে মুকাবিলা করা হবে ? তখনো নবী করীম (স) এ ফায়সালা সাথীদের সাথে পরামর্শ করেই করেন। একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, আবেগ উদ্দীপ্ত নওজোয়ানদের অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে তিনি ফায়সালা গ্রহণ করেন যে, তরুণরা কম বয়সের জন্য বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং এখন জীবন বাজী রাখতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। এর ফলে মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে।

আহযাবের যুদ্ধের (৫ম হিজরী) সময়টা ছিলো খুবই নাজুক। গোটা আরব দুশমনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাদের হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত পবিত্র মদীনাকে ঘেরাও করে রাখে। সেখানেও পরামর্শের মাধ্যমেই তিনি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী খন্দক খনন করেন। পিছেই ছিলো ইহুদীদের কেল্লা ও ঘাটিসমূহ। যে কোনো সময় তাদের থেকে গাদ্দারীর আশংকা ছিলো। কুরাইশরা তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতো। এমনকি মুসলমানদের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করতে তারা উদ্যত হয়। অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করে নবী করীম (স) বনু গাতফানের সাথে সন্ধির কথাবার্তা আরম্ভ করেন। তিনি চাইছিলেন তারা মদিনায় উৎপাদিত এক-তৃতীয়াংশ ফল গ্রহণ করুক এবং কুরাইশের সঙ্গ ত্যাগ করে মুসলমানদের সাথে সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ফিরে আসুক।

কিন্তু এ ব্যাপারটি নিয়েও তিনি তাঁর সাথীদের সাথে পরামর্শ করেন। আনসারদের মধ্য থেকে সাআদ ইবনে উবাদা (রা) এবং সাআদ ইবনে মুয়ায জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আপনার নিজের ইচ্ছা না আল্লাহর নির্দেশ ? তিনি বললেন, না এটা আমারই ইচ্ছা। আমি তোমাদের রক্ষা করতে এবং শত্রুদের শক্তি ভেঙে দিতে চাচ্ছি।' উভয় সরদার বললেন ঃ আমরা যখন মুসলমান ছিলাম না, তখনো এসব কবীলা আমাদের থেকে কর আদায় করতে পারেনি। তারা কি এখন আমাদের থেকে কর উসূল করবে ? একথা বলে মূলত তারা সেই খসড়া চুক্তিনামাকে ছিন্ন করে দিলেন, যাতে কেবল স্বাক্ষর করা বাকী ছিলো। ব্যাপার এ নয় যে, নবী করীম (স)-এর মধ্যে কোনো প্রকার দুর্বলতা

ছিলো। বরঞ্চ, পরামর্শ নেয়াটা ছিলো হিকমত ও বুদ্ধিমত্তার কাজ। এতে করে সন্ধি করার কল্পনা দূর হয়ে যায় এবং লড়াই-সংগ্রাম করার সংকল্প জীবিত ও স্থায়ী করার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। লোকদের মনোবল দৃঢ় হয়ে যায়। এবং তাদের নব শক্তি ও প্রেরণা-উদ্দীপনা জাগ্রত হয়।

এসব বিষয়ে একজন একনায়ক ক্ষমতাবান লীডারের মতো নিজে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার পরিবর্তে নবী করীম (স) প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্তে স্বীয় সাথীদের শরীক রাখতেন অথচ কোনো লীডারের জন্য নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা চাপিয়ে দেবার অধিকার থেকে থাকলে তা কেবল নবী করীম (স)-এরই ছিলো। আর কারো নয়। এমনটি করা হলে মনে প্রাণে যার আনুগত্য করা হতো তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স) কারণ, তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় কোনো নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল।

এসব পরামর্শ সভায় অংশ গ্রহণকারীরা পূর্ণ আযাদীর সাথে কথা বলতো। নিজেদের মতামত পেশ করতো। আলোচনা-পর্যালোচনা করতো। দলীল প্রমাণ পেশ করতো। এসব ব্যাপারে কোনো বাধা নিষেধ ছিলো না। মুনাফিকরা এসব সভায় অংশগ্রহণ করতো। এ প্রসঙ্গে কুরআনে যে হেদায়াত এসেছে, তা থেকে অবস্থা অনুমান করা যায় যে, সে সভাগুলোতে কি হতো। কেউ গলাফাটা চিৎকার করে নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতো, সে চাইতো কেবল তার কথাই শুনা হোক, তার কথাই মেনে নেয়া হোক এবং আল্লাহ ও রাসূলের কথার চাইতেও তার কথাকে অগ্রাধিকার দেয়া হোক। এসব অবস্থায় মুখরোচক কথাবার্তা, যুক্তি-প্রমাণের প্রাচুর্য, কসমের আধিক্য, অনর্গল বক্তৃতা, এসব কিছুই হতো।[১]

ঞ. বিনয়

নবী করীম (স) সম্পর্কে সর্বশেষ যে কথাটি বলে আমি আমার এ আলোচনা শেষ করতে চাই। তাহচ্ছে এই যে, নবী করীম (স) কখনো কোনো প্রকারে কোনো দিক থেকে নিজেকে বড় ও বিরাট করে রাখেননি। তিনি এরূপ করলে অন্যায় কিছুই হতো না। তিনিই সবার চেয়ে বড় হয়ে থাকার অধিকারী ছিলেন। তাঁর চেয়ে অহংকারী আর কে হতে পারতো ? তিনি শুধু মানুষই ছিলেন না। ছিলেন আল্লাহর রাসূল। তাঁর সীনায় অহী নাযিল হতো। তাঁর প্রতি লোকেরা ছিলো পতঙ্গের মতো ফেদা, কিন্তু এসব

---

১. দ্রষ্টব্য ঃ সূরা আল হুজুরাত ঃ ১-৩ আয়াত

সত্ত্বেও তিনি সর্বদা বিনয়ের নীতি অবলম্বন করেছেন। সর্বসাধারণ সাথীদের সাথে তাদেরই মতো উঠাবসা, চলাফেরা এবং পানাহার করতেন। তাদেরই মতো পোশাক পরিধান করতেন। কোনো দিক থেকে অন্যদের তুলনায় বিশেষত্ব অবলম্বন করেননি। দূর থেকে লোকেরা মজলিসে এসে জিজ্ঞেস করতো মুহাম্মাদ কে ? নিজের সম্মানার্থে লোকদের দাঁড়াতে তিনি নিষেধ করেছেন। যে-ই তাঁকে একটু বিশিষ্টতা দিতে চেয়েছে, তিনি তাকে বাধা দিয়েছেন। কেউ বলেছিল, তিনি মূসা (আ) থেকে উত্তম। তিনি তাকে একথা বলতে নিষেধ করেন। কোনো একজন বলেছিলেন, 'যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল চান।' তিনি তাকে এরূপ বলতে বাধা দেন। তাঁর নিজেকে উদ্দেশ্য বানানোর দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে তিনি মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক ও আসক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে গড়ে তুলতে চেয়েছেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ

انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ـ ال عمران : ١٤٤

"মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে যদি মরে যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা উল্টা দিকে ফিরে যাবে ?"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৪

মনোবাসনা

সর্বশেষ আরয এই যে, এ হচ্ছে মুহাম্মাদ (স)-এর সীরাত। ব্যক্তিত্ব ও আখলাকের সেই নূর যা দ্বারা বর্তমান দুনিয়ায় দাওয়াত ও আন্দোলনের পতাকাবাহীদের প্রদীপ জ্বালানো উচিত আমাদের মধ্য থেকে কারোই তাঁর সমমানে পৌছার স্বপ্ন পর্যন্ত দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু তিনি এ আন্দোলনের জীবন্ত মডেল, সে কারণে এ নূর দ্বারা যতোটা সম্ভব নৈতিক চরিত্রকে, অন্তরাত্মাকে এবং নিজেদের আমলী জিন্দেগীকে রওশন করে নিতে হবে। আমরা যতো বেশী তাঁর নিকটবর্তী হতে পারবো, ততোবেশী আমাদের রব আমাদের মহব্বত করবেন। আমাদের দুর্বলতাসমূহ দূর করে দেবেন। আমাদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দেবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ---দের কামিয়াব করবেন।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○- ال عمران : ٣١

"(হে নবী!) লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালো বাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

সমাপ্ত